তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

তৃতীয় খণ্ড

[সূরা মায়িদা থেকে সূরা আ'রাফ]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সূরা মায়েদা	১
পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি	১২
জাতীয়তা বন্টন	১৪
জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা	১৫
ঈদ ও উৎসবপর্ব উদযাপনের ইসলামী মূলনীতি	২৫
আহ্‌লে-কিতাবের খাদ্য	৪০
আহ্‌লে কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুর হুকুম	৪১
পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ইত্যাদির হুকুম	৫৯
খৃস্টান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক শত্রুতা	৭২
'ফাতরাত' বা নবীগণের মধ্যবর্তীকাল	৭৮
অন্তর্বর্তীকালের বিধান	৭৯
শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত	৭৯
পবিত্র ভূমির মর্ম	৮৬
জাতির চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মূসা (আ)-র অপরিসীম দৃঢ়তা	৯০
হাবিল ও কাবিলের কাহিনী	৯৭
সৎকর্ম গৃহীত হওয়া আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল	১০০
কুরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি	১০২
শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার	১০৩
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মোকদ্দমা বিধি	১২৯
ইহুদীদের কয়েকটি বদভ্যাস	১৩১
আলিমগণের অনুসরণ করার বিধি	১৩১
কোরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক	১৪৪
পয়গম্বরগণের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য	১৪৫
ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয়	১৬৫
কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি	১৬৫
আলিম ও পীর মাশায়েখের প্রতি হুঁশিয়ারী	১৬৬
আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায়	১৭৩
প্রচারকার্যের তাকীদ	১৭৪
বিদায় হজ্জে মহানবী (সা)-র একটি উপদেশ	১৭৪
আহ্‌লে কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ	১৭৭
শরীয়তের বিধি তিন প্রকার	১৭৮
চার শ্রেণীর লোকের মুক্তির ওয়াদা	১৭৯
সাফল্য লাভ কর্মের উপর নির্ভরশীল	১৮০
বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ	১৮৪
মসীহ্ (আ)-এর উপাস্যতা খণ্ডন	১৮৭
হযরত মরিয়ম পয়গাম্বর ছিলেন কি ওলী	১৮৮
বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি	১৯১
আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার পথ	১৯১
মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ	১৯৩
বনী ইসরাঈলের কুপরিণতি	১৯৩
কতিপয় আহলে-কিতাবের সত্যানুরাগ	১৯৬
সংসার ত্যাগের হুকুম	২০০
শপথ বা কসমের প্রকার ও তার বিধান	২০২
আযলামের ব্যাখ্যা	২০৬
মদ ও জুয়ার দৈহিক ও আত্মিক ক্ষতি	২০৭
শাস্তির চারটি উপায়	২১৭
কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ	২১৮
বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্বশান্তির কারণ	২১৮

মহানবী (সা)-র নবুওয়ত ও ওহীর সমাপ্তি ২২৬
বহিরা, সায়েবা প্রভৃতির সংজ্ঞা ২২৬
অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ ২২৯
অনুসরণের মাপকাঠি ২২৯
কাফিরের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্য ২৩৭
কিয়ামতে পয়গম্বরগণ সর্বপ্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন ২৪০
একটি সন্দেহের নিরসন ২৪১
হাশরে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন ২৪৩
হযরত ঈসা (আ)-র সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর ২৪৩
মো'জেযা দাবী করা মু'মিনের পক্ষে অনুচিত ২৪৭

সূরা আল-আন'আম

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা ২৭৭
কাফিরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দান ২৯০
সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুত্ব ২৯৪
কাফিরদের পক্ষ থেকে ফরমায়েশী মো'জেযার দাবী ৩০১
অহংকার ও মূর্খতা দূরীকরণ, মান-অপমানের ইসলামী মাপকাঠি ৩০৮
কতিপয় নির্দেশ ৩১২
গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র ৩২০
কোরআনের পরিভাষায় অদৃশের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র ৩২১
আল্লাহ্র জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা ৩২৯
বিপদাপদের আসল প্রতিকার ৩৩০
আল্লাহ্র শাস্তির তিনটি প্রকার ৩৩৪
বাতিলপন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ৩৪৫
বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহবান ৩৫৩
প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ ৩৫৭
রাত্রির আগমন একটি নিয়ামত ৩৭৪
স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা ৩৮৫
মু'মিন জীবিত আর কাফির মৃত ৪০৯
ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার ৪১১
নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয় ৪১৬
সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা ৪১৮
হাশরে দল গঠন ৪২৬
দুনিয়ার সংঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাব ৪২৭
জ্বিনদেরই হিন্দুদের কোন রসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা ৪২৯
মানুষের মুখাপেক্ষিতার তাৎপর্য ৪৩৩
কাফিরদের হুঁশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ৪৩৬
ক্ষেতের ওশর ৪৪৩

সূরা আ'রাফ ৪৮৯

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার জন্য ইবলিসের দোয়া প্রসঙ্গে ৫০১
কাফিরদের দোয়া কবূল হতে পারে কিনা? ৫০৩
আদম ও ইবলিসের ঘটনার বিভিন্ন ভাষা ৫০৩
মানুষের উপর শয়তানের হামলা ৫০৪
পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা ৫০৯
ঈমানের পরবর্তী ফরয গুপ্তাঙ্গ ঢাকা ৫০৯
নামাযের পোশাক ৫১৯
প্রয়োজনীয় পানাহার ৫২০
উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ৫২৫
জান্নাতীদের মনের পারস্পরিক মলিনতার অপসারণ ৫৩৬
হিদায়তের বিভিন্ন স্তর ৫৩৮
সমগ্র পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ ৫৪৮
ভূ-পৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম ৫৫৭
'আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৫৭৫
হযরত হূদ (আ)-এর বংশ তালিকা ও আংশিক জীবনচরিত ৫৭৬

প্রথম সংস্করণে অনুবাদকের আরয

আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের বঙ্গানুবাদ তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হলো। আট খণ্ডে সমাপ্ত এই সুবৃহৎ তফসীর গ্রন্থটির আয়াসসাধ্য অনুবাদের কাজ আল্লাহ্র রহমতে বহু আগেই সমাপ্ত হলেও বাংলা-আরবীর মিশ্রিত মুদ্রণ কার্য এক দুর্লংঘ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আল্লাহ্র অপরিসীম কৃপায় অল্প সময়ের ব্যবধানেই পরপর তিনটি খণ্ডের অনুবাদ আগ্রহী পাঠকগণের খেদমতে পেশ করে আমরা ধন্য হয়েছি।

'মা'আরেফুল-কোরআন' বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার ন্যায় বিরাট একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ, বিশেষত ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দীন, প্রশাসক জনাব মেজর (অবঃ) এরফান উদ্দীন এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। পাঠকবর্গের প্রতি আবেদন, তাঁরা যেন এ বিরাট কাজের সাথে যাঁরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবারই ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দো'আ করেন।

তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের ব্যাপারে আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আযীয, জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী এবং জনাব মাওলানা সৈয়দ জহিরুল হক সাহেবান। এঁদের সবার প্রতিই আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

সূরা মায়েদা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যাহা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে উহা ব্যতীত। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্দেশ দেন।

শানে নযুল ঃ এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়েদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মসনদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উমর (রা) ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)-এর থেকে বর্ণিত আছে, সূরা মায়েদা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সফরে 'আযবা' নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণত ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও চাপ অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা যায়, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর। বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হুযুর (সা) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহ্‌রে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন ঃ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্জের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে আবূ ওবায়দাহ্‌ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়া ইবনে কায়েস বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

المائدة من اٰخر القراٰن تنزيلا فاحلوا حلالها وحرّموا حرامها -

অর্থাৎ 'সূরা মায়েদা কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হারাম মনে করো।'

ইবনে-কাসীরে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি একবার হজ্জের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ জুবায়ের! তুমি কি সূরা মায়েদা পাঠ কর? তিনি আরয করলেনঃ জী-হ্যাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এটি কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো।

সূরা মায়েদাতেও সূরা নিসার মত মাস'আলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেনঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানত মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ যথা---তওহীদ, রিসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দুটি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, ইয়াতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর।' এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা ওকূদ। অর্থাৎ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা।---(বাহ্‌রে-মুহীত)

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি, বিশেষ করে, এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন আমর ইবনে হাযম (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন সে ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ (তোমাদের ঈমানের দাবী এই যে)! স্বীয় অঙ্গীকারসমূহ (যা ঈমান

প্রসঙ্গে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে করেছ) পূর্ণ কর। (অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন কর। কেননা, ঈমানের কারণে এগুলো আপনা-আপনি জরুরী হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন তা পূর্ণ করতে হবে, নতুবা জরুরী হওয়ার কোন মানে নেই।) তোমাদের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু (যেগুলো সেসব জন্তুর সমতুল্য, যেগুলোর হালাল হওয়া ইতিপূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমে জানা গেছে, যেমন, উট, ছাগল, গরু) হালাল করা হয়েছে। (যেমন---হরিণ, বন্য গরু ইত্যাদি। এগুলো হিংস্র ও শিকারী না হওয়ার দিক দিয়ে উট, ছাগল ও গরুরই সমতুল্য। তবে শরীয়তের অন্যান্য প্রমাণ, হাদীস ইত্যাদির দ্বারা যেসব চতুষ্পদ জন্তুর হারাম হওয়া জানা গেছে, সেগুলো বাদে। যেমন---গাধা, খচ্চর ইত্যাদি। এসব ব্যতিক্রম ছাড়া বাকী সমস্ত গৃহপালিত ও বন্য চতুষ্পদ জন্তুই হালাল।) কিন্তু যা তোমাদের প্রতি (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ----- আয়াতে) বিবৃত হবে। (সেগুলো চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস ইত্যাদি দ্বারা হারামকৃত জন্তু বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও হারাম। অবশিষ্ট সবই তোমাদের জন্য হালাল।) কিন্তু (এগুলোর মধ্যে) যেগুলো শিকারযোগ্য সেগুলোকে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়, (অথবা হেরেমে অবস্থানকালে) হালাল মনে করবে না। (উদাহরণত হজ্জ ও ওমরার ইহ্‌রাম বাঁধলে হেরেমের বাইরে থাকলেও শিকার করা হালাল নয়। অথবা হেরেমের অভ্যন্তরে অবস্থান করে ইহ্‌রাম বাঁধা হোক বা না হোক শিকার করা হারাম।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই নির্দেশের উপযোগিতা। তিনি যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য অপারকতার সময় ছাড়া হারাম করে দেন এবং যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন চিরকালের জন্য হালাল করে দেন। এছাড়া যে জন্তুকে ইচ্ছা করেন, এক অবস্থায় হালাল করে দেন এবং অন্য অবস্থায় হারাম করে দেন। সর্বাবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালন করা তোমাদের কর্তব্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবী। এরপর বলা হয়েছে ঃ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - عقود শব্দটির - عقد শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা,

আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়। এভাবে عقود –এর অর্থ হয় عهود অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জারীর উপরিউক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ী-দের 'ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস বলেনঃ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্যবাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عهد, عقد ও معا هدة বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে, আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তফসীরবিদদের বাহ্যত বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

তফসীরবিদ ইবনে সা'আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এখানে ঐসব চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পর একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেনঃ এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বোঝানো হয়েছে, যা জাহি-লিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরবিদও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। অতএব, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেনঃ যত প্রকার চুক্তি আছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেনঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। এক--পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণত ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। দুই---নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মানত মানা অথবা কসমের মাধ্যমে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া। তিন--মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সেসব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেনদেন, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেসব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলাও প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ

করার কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্য বৈধ নয়।

অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে উপরিউক্ত ব্যাপক আইনের খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ---যেসব জন্তুকে সাধারণ-ভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بهيمة (নির্বোধ প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مبهم তথা দুর্বোধ্য থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন ঃ সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بهيمة বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নেই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়, বরং প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন প্রাণীই মূলত বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে স্তরের পার্থক্য অবশ্যই আছে। এগুলোর মধ্যে ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের মধ্যে আছে। এ কারণেই মানুষ বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট হয়েছে, কিন্তু জন্তুরা আদিষ্ট হয়নি। অবশ্য নিজ নিজ প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জন্তু, এমন কি বৃক্ষ এবং প্রস্তরকেও বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার গুণগান করে। বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ---বুদ্ধি না থাকলে এগুলো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার পরিচয় কিভাবে লাভ করতো এবং কেমন করেই বা তাঁর পবিত্রতা জপ করতো?

ইমাম শা'রানীর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, বুদ্ধিহীনতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জীব-জন্তুর কাছে অস্পষ্ট থাকে বলেই এগুলোকে بهيمة বলা হয় না, বরং এর কারণ এই যে, তাদের ভাষা মানুষ বুঝে না। তাদের কথা মানুষের কাছে অস্পষ্ট। মোট কথা, প্রত্যেক প্রাণীকেই بهيمة বলা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

• أنعام শব্দটি نعم—এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত জন্তু। যেমন---উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে أنعام বলা হয়। بهيمة শব্দের ব্যাপকতাকে أنعام শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, আট প্রকার গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ প্রয়োগ করে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দাদের কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ

অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্ করে খেতে পার।

তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশটি যথাযথ সীমার ভেতরে রেখে মেনে চল। অগ্নি-উপাসক ও মূর্তি-পূজারীদের মত সর্বাবস্থায় এসব জন্তুকে যবেহ করা হারাম মনে করো না। এতে খোদায়ী প্রজ্ঞায় আপত্তি এবং খোদায়ী নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। অপরদিকে অন্যান্য মাংসভোজী সম্প্রদায়ের মত বল্গাহীনভাবে যে কোন জন্তুকে আহার্যে পরিণত করো না। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন অনুযায়ী হালাল জন্তুসমূহের গোশ্ত ভক্ষণ কর এবং হারাম জন্তু থেকে বেঁচে থাক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেক জন্তুর স্বরূপ বৈশিষ্ট্য এবং ভক্ষণকারী মানুষের মধ্যে তার সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তুকেই মানুষের জন্য হালাল করেছেন, যা খেলে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও আত্মিক চরিত্রের উপর কোনরূপ মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। তিনি নোংরা ও অপবিত্র জন্তুর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এগুলো মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক অপকারী অথবা এতে মানব চরিত্র বিনষ্ট হয়। এ কারণেই বর্ণিত ব্যাপক নির্দেশ থেকে কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ সেসব জন্তু ছাড়া, যেগুলোর অবৈধতা কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন--মৃত জন্তু, শূকর ইত্যাদি। দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ চারপেয়ে জন্তু ও বনের শিকার তোমাদের জন্য হালাল। কিন্তু তোমরা যখন হজ্জ অথবা ওমরার ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় থাক, তখন শিকার করা অপরাধ ও গোনাহ্। আয়াতের উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। তা মেনে চলতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এতে সম্ভবত এ রহস্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে. যে, মানুষকে কিছু সংখ্যক জন্তু যবেহ করে খাওয়ার অনুমতি প্রদান অন্যায় নয়। যে প্রভু এসব প্রাণী সৃজন করেছেন তিনিই পূর্ণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে এ আইন রচনা করেছেন। তিনিই কতিপয় নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের খাদ্য করেছেন। মাটি বৃক্ষ ও তরুলতার খাদ্য, বৃক্ষ জীব-জন্তুর খাদ্য এবং জীব-জন্তু মানুষের আহার্য। মানুষের চাইতে সেরা জীব পৃথিবীতে নেই। কাজেই মানুষ কারো খাদ্য হতে পারে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

(২) হে মু'মিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর; যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদের বাধা দান করেছিল, সে সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

যোগসূত্র ঃ সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্ধারিত হালাল ও হারাম মেনে চলা সম্পর্কিত। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে এ অঙ্গীকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দফা বর্ণিত হচ্ছে। এক---আল্লাহ্‌ তা'আলার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং অসম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। দুই---স্বজন ও ভিন্নজন, শত্রু ও মিত্র সবার সাথে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করা এবং অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় করার নিষেধাজ্ঞা।

কয়েকটি ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের হেতু। প্রথমে ঘটনাগুলো জেনে নেওয়া দরকার, যাতে আয়াতের বিষয়বস্তু পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হোদায়বিয়ার ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ্‌ পালন করতে মনস্থ করেন। সেমতে তিনি সহস্রাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে ওমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মক্কাবাসীদের সংবাদ দেন যে, আমরা কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু ওমরাহ্‌ পালন করার জন্য আগমন করেছি। আমাদের মক্কা প্রবেশের অনুমতি দাও। মক্কার মুশরিকরা অনুমতি প্রদানে সম্মত হলো না এবং কঠোর ও কড়া শর্তাবলীর অধীনে এরূপ চুক্তি সম্পাদন করলো যে, আপাতত সবাই ইহ্‌রাম খুলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। আগামী বছর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আগমন করবে এবং মাত্র তিনদিন

অবস্থান করে ওমরা পালন করে মক্কা ত্যাগ করবে। এ ছাড়া আরও এমন কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, যা মেনে নেওয়া বাহ্যত মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও আত্মসম্মানের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে সবাই মদীনায় ফিরে গেলেন। অতঃপর সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে পুনরায় চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে এ ওমরার কাযা করা হয়। মোটকথা, হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং উপরিউক্ত অবমাননাকর শর্তাবলী সাহাবায়ে-কিরামের অন্তরে মক্কার মুশরিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কার মুশরিক হাতীম ইবনে হিন্দ পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় আগমন করে। পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার পর সে সঙ্গী লোকজন ও জিনিসপত্র মদীনার বাইরে রেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং কপটতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করে। তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুসলমানরা তার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না করে। কিন্তু তার আসার আগেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের বলে দিয়েছিলেন যে, আজ আমার কাছে এক ব্যক্তি আসবে। সে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে। হাতীম ফিরে যাবার পর হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ লোকটি কুফর নিয়ে এসেছিল এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ফিরে গেছে। সে দরবার থেকে বের হয়ে সোজা মদীনার বাইরে পৌঁছল এবং মদীনাবাসীদের বিচরণরত উট-ছাগল হাঁকিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সাহাবায়ে-কিরাম এ সংবাদ অবগত হয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন, কিন্তু ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে চলে যায়। এরপর হিজরতের সপ্তম বছরে যখন সাহাবায়ে-কিরাম রসূল (সা)-এর সাথে ওমরার কাযা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তখন দূর থেকে 'লাব্বাই কা' ধ্বনি শুনে দেখলেন, সেই হাতীম ইবনে হিন্দ মদীনাবাসীদের কাছ থেকে চোরাই করা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছে। তখন সাহাবায়ে-কিরামের মনে ইচ্ছা জাগে যে, আক্রমণ করে এর কাছ থেকে জন্তু-জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নেন এবং এর ভবলীলা এখানেই সাঙ্গ করে দেন।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা মুকাররমা বিজিত হয় এবং প্রায় সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার মুশরিকদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আপন কাজ করতে থাকে। এমনকি, জাহিলিয়াত যুগের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরা পালন করতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে-কিরামের মনে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনা জাগরিত হয়। তাঁরা ভাবতে থাকেন---এরা সম্পূর্ণ বৈধ ও সত্য পন্থায় ওমরা পালন করতে আমাদের বাধাদান করেছিল, আমরা তাদের অবৈধ ও ভ্রান্ত পন্থায় ওমরা ও হজ্জ পালনের সুযোগ দেব কেন ? আমরা তাদেরকে আক্রমণ করে জানোয়ার কেড়ে নেব এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব।

তফসীরবিদ ইবনে-জারীর ইকরিমা ও সুদ্দীর বর্ণনার মাধ্যমে এসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তোমাদের নিজ দায়িত্ব। কোন শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে এ দায়িত্বে ত্রুটি করার অনুমতি

নেই। নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহও বৈধ নয়। কুরবানীর জন্তুকে হেরেমে পৌঁছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়াও জায়েয নয়। যেসব মুশরিক ইহ্‌রাম বেঁধে নিজ ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, যদিও কুফরের কারণে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, তথাপি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর সংরক্ষণ ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের বাধা দান করা যাবে না। এছাড়া, যারা ওমরা করতে তোমাদের বাধা দিয়েছিল, তাদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে তাদের মক্কা প্রবেশে অথবা হজ্জব্রত পালনে বাধাদান করা বৈধ হবে না। কেননা, এভাবে তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে তোমাদের পক্ষ থেকেও অন্যায় হয়ে যাবে। এটা ইসলামে বৈধ নয়। এবার আয়াতের পূর্ণ তফসীর দেখুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ, অবমাননা করো না আল্লাহ্ তা'আলার (ধর্মীয়) নিদর্শনাবলীর (অর্থাৎ যেসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে আল্লাহ্ তা'আলা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, সেসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তৎপ্রতি বে-আদবী করো না। উদাহরণত হেরেম ও ইহ্‌রামের আদব এই যে, এতে শিকার করতে পারবে না। অতএব, শিকার করা বে-আদবী ও হারাম হবে)। এবং সম্মানিত মাসসমূহের (অবমাননা করো না অর্থাৎ এসব মাসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না)। এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুর (অবমাননা করো না। অর্থাৎ এগুলোকে ছিনিয়ে নিও না) এবং ঐসব জন্তুর (অবমাননা করো না) যেগুলোর (গলায় এরূপ চিহ্নিতকরণের জন্য) কণ্ঠাভরণ রয়েছে (যে এগুলো আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিবেদিত—হেরেম শরীফে যবেহ্ করা হবে) এবং ঐসব লোকের (অবমাননাকরো না) যারা বায়তুল-হারাম (অর্থাৎ কাবাগৃহ) অভিমুখে যাচ্ছে এবং স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। (অর্থাৎ এসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে কাফিরদের সাথেও ফাসাদে জড়িত হয়ো না) এবং (পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে ইহ্‌রামের আদব রক্ষার্থে শিকার হারাম করা হয়েছিল, তা শুধু ইহ্‌রাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নতুবা) তোমরা যখন ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে আস, তখন (অনুমতি আছে) শিকার কর (তবে হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করো না)। এবং (পূর্বে যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তাতে) যারা (হোদায়বিয়ার বছরে) পবিত্র মসজিদ থেকে (অর্থাৎ পবিত্র মসজিদে যেতে) তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, (অর্থাৎ মক্কার কাফির সম্প্রদায়) সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (শরীয়তের) সীমালংঘনে প্রবৃত্ত না করে (অর্থাৎ তোমরা উল্লেখিত নির্দেশসমূহের যেন বিরুদ্ধাচরণ না করে বস) এবং সৎকর্ম ও আল্লাহ্-ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর (উদাহরণত উল্লিখিত নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে অপরকেও উৎসাহিত কর) এবং পাপ ও সীমা-লংঘনে একে অন্যের সহায়তা করো না। (উদাহরণত কেউ উল্লিখিত নির্দেশসমূহের বিরোধিতা করলে তোমরা তার সাহায্য করো না)। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর (এতে বিধি-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়ে যায়)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (নির্দেশ অমান্যকারীদের) কঠোর শাস্তিদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ—অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شعائر اسلام তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলী' বলা হয়। যেমন নামায, আযান, হজ্জ, সুন্নতী দাড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী ও আতা (র) থেকে বর্ণিত বাহ্‌রে-মুহীত ও রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজিব, ফরয ও এগুলোর সীমা। আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা এই যে, মূলতই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়ত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়ত এই যে, নির্ধারিত সীমালংঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছেঃ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহ্-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছেঃ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۝

অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্জ ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরীয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলিমদের মতে পরবর্তীকালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

এ ছাড়া হেরেমে কুরবানী করার জন্য, বিশেষত যেসব জন্তুর গলায় কুরবানীর চিহ্ন স্বরূপ কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে, এদের হেরেম পর্যন্ত পৌঁছুতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন---আরোহণ করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজ্জের জন্য পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিও না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ---অর্থাৎ প্রথম আয়াতে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকার করতে পারবে।

উল্লিখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রথমে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ্জ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমনকারী যাত্রী সাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানীর জন্তুদের গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا -

অর্থাৎ যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিয়ো না যে, তোমরা তাদের কা'বাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্জ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তর এরূপ

হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরাও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাদেরকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক, সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য।

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তর অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায়বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি ঃ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য।

এতে কোরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা-ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসাবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোট কথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো-লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যই জরুরী নয়—মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এর পরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইসালে-সওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সামর্থ্য দ্বারা বিশ্বচরাচরের জন্য এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিন-মজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকদের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল

নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো! এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো; যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্য-বোধের হচ্ছে। যদি এ কর্ম বন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারাবিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস-আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা সে কারবারকেই নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছে।

هریکے را بهرکارے ساختند
میل اورا در دلش انداختند!

যদি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সরকার কর্ম বন্টন করতো এবং কোন দলকে ছুতারের কাজের জন্য, কাউকে কর্মকারের কাজের জন্য, কাউকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য, কাউকে পানির জন্য এবং কাউকে খাদ্য সংস্থানের জন্য নিযুক্ত করতো, তবে কোন্ ব্যক্তি এ নির্দেশ পালনের জন্য দিনের শান্তি ও রাতের নিদ্রা নষ্ট করতে সম্মত হতো।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানবকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার অন্তরে সে কাজের আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত করে দিয়েছেন। ফলে সে কোনরূপ আইনগত বাধ্য-বাধকতা ছাড়াই সে কাজকেই জীবনের একমাত্র করণীয় কাজ বলে মনে করে। এর দ্বারাই সে জীবিকা অর্জন করে। এ অটুট ব্যবস্থার ফলশ্রুতি এই যে, মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র কয়েকটি টাকা খরচ করলেই অনায়াসে অর্জিত হয়ে যায়। রাঁধা খাদ্য, সেলাই করা পোশাক, নির্মাণ করা আসবাবপত্র, তৈরী করা গৃহ ইত্যাদি সবকিছু একজন মানুষ কিছু পয়সা ব্যয় করেই অর্জন করতে পারে। এ ব্যবস্থা না থাকলে একজন কোটিপতি মানুষ সমস্ত সম্পদ লুটিয়ে দিয়েও একদানা শস্য অর্জন করতে পারতো না। আপনি হোটেলে অবস্থান করে যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার আটা আমেরিকার, ঘি পাঞ্জাবের, গোশত সিন্ধু প্রদেশের, মসলা বিভিন্ন দেশের, থালা-বাসন ও আসবাবপত্র বিভিন্ন দেশের, খেদমতগার বেয়ারা-বাবুর্চি বিভিন্ন শহরের। তারা সবাই আপনার সেবায় নিয়োজিত। যে লোকমাটি আপনার মুখে পৌঁছে, তাতে লাখো যন্ত্রপাতি, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ কাজ করেছে। এর পরেই তা আপনার মুখরোচক হতে পেরেছে। আপনি ভোরবেলায় ঘর থেকে বের হন। তিন চার মাইল দূরে যেতে হবে। আপনার এতটুকু শক্তি অথবা সময় নেই, আপনি নিকটবর্তী কোন স্থানে ট্যাক্সি, রিকশা অথবা বাস দাঁড়ানো দেখতে পাবেন--যার লোহা অস্ট্রেলিয়ার, কাঠ বর্মার, যন্ত্রপাতি আমেরিকার, ড্রাইভার সীমান্ত প্রদেশের এবং কণ্ডাক্টর যুক্ত প্রদেশের। চিন্তা করুন, এ কোন কোন জায়গার সাজ-সরঞ্জাম, কোন কোন জায়গার মানুষ আপনার সেবার জন্য দণ্ডায়মান! আপনি কয়েকটি পয়সা দিয়ে তাদের সবার খেদমত হাসিল করতে পারেন। কোন্ সরকার তাদের বাধ্য করেছে এবং কোন্ ব্যক্তি

আপনার জন্য এগুলো সরবরাহ করতে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে? বলা বাহুল্য, এগুলো আল্লাহ্‌র ব্যবস্থারই ফল। অন্তরের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে এ আইন জারি করে দিয়েছেন।

আজকাল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আল্লাহ্‌র এ ব্যবস্থা পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে কি করবে, তা নির্ধারণ করা সরকারের দায়িত্ব। এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মানবীয় স্বাধীনতা হরণ করতে হয়েছে। ফলে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং হাজারো মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। অবশিষ্ট মানুষগুলোকে কঠিন উৎপীড়ন ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মেশিনের কলকব্জার মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে কোন জায়গায় কোন বস্তুর উৎপাদন বেড়ে গেলেও তা মানুষের মানবতা ধ্বংস করেই বেড়েছে। অতএব, সওদাটি যে সস্তা নয়, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আল্লাহ্‌র ব্যবস্থায় একদিকে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং অপরদিকে আল্লাহ্‌র বন্টনের কারণে বিশেষ বিশেষ কাজ করতে বাধ্যও। এ বাধ্যবাধকতা যেহেতু স্বভাবজাত, এ কারণে কেউ একে জোর-জবরদস্তি মনে করতে পারে না। কঠোরতর পরিশ্রম এবং নিকৃষ্টতম কাজের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার এবং চেষ্টা সহকারে তা অর্জন করার লোক সর্বত্র ও সর্বকালে পাওয়া যায়। কোন সরকার যদি তাদের এ কাজে বাধ্য করা শুরু করে, তবে তারা পালাতে থাকবে।

মোট কথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাপনাকে তছনছও করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি---যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বান্‌চাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গল্য-মঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভবও ছিল না। এখন অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়, বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা স্বীয় হিফাযতের জন্য বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে---যাতে এক দল অথবা এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বন্টন ঃ আবদুল করীম শাহরাস্তানী প্রণীত 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশী ছিল না তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে ঃ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর। প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এইভাবে যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ-গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত

ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনু হাশেম এক জাতি, বনু তামীম অন্য জাতি এবং বনু খোযাআহ্ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চ জাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যদের রক্তধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা এবং বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানব জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পৃথক পৃথক জাতি দাঁড় করে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, মুসলমানরাও এ যাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধির বিভাগই নয়, বরং তাদের মধ্যের ভাগফলকেও ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজদী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধি, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা ঃ কোরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সব মানুষ এক পিতামাতার সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্-আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবূ জাহ্ল ও আবূ লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও সুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

—"হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবশা থেকে এবং সুহায়েব রোম থেকে এলেন, অথবা মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহ্ল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার!" এমন কি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে ঃ

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ—কিছু কাফির হয়ে গেছ এবং কিছু মু'মিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের

বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নিচে এসে গিয়েছিল। বদর, ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد
فدائی یک تن بیگانه که آشنا باشد

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার এই যুক্তিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ মূলনীতিই কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করেছে ঃ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ —অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ্-ভীতিতে পরস্পরে সহযোগিতা কর—পাপকর্ম ও সীমালংঘনে সহযোগিতা করো না।

চিন্তা করুন, উল্লিখিত আয়াতে কোরআন পাক একথা বলেনি যে, মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা কর এবং অন্যের করো না। বরং মুসলমানের সহযোগিতার যে আসল ভিত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ্-ভীতি—তাকেই সহযোগিতার বুনিয়াদ করা হয়েছে।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য—যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انصر اخاك ظالمًا او مظلومًا —অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য কর—সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। সাহাবায়ে-কিরাম ছিলেন কোরআনের রঙে রঞ্জিত। তাঁরা বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রসূলুল্লাহ্, অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখ। এটাই তাকে সাহায্য করা।

কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহ্-ভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার-উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بر ও تقوى দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بر শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারদের মতে فعل الخيرات অর্থাৎ, সৎকর্ম এবং تقوى শব্দের অর্থ ترك المنكرات অর্থাৎ মন্দ কাজ বর্জন। اثم শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম—অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদত সম্পর্কিত। عدوان শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও আল্লাহ্-ভীতিতে সাহায্য করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الدال على الخير كفاعله — অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু সওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত।— (ইবনে-কাসীর)

সহীহ্ বোখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, তার আহ্বানে যত লোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান সওয়াব পাবে। এতে তাদের সওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহ্বানে যত লোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাহ্ তারও হবে। এতে তাদের গোনাহ্ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষিগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকরি ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূহুল-মা'আনীতে فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ —আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে---অত্যাচারী ও তাদের সাহায্য-কারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কোরআন ও সুন্নাহ্র এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে খাড়া করে দিয়েছিল এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলে-ছিল, যারা আল্লাহ্-ভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে; এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশংকা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্য জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান-প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না, বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে تقوى ও بر তথা সৎকর্ম ও আল্লাহ্-ভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং عدوان ও اثم তথা পাপ এবং অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম,

ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সব দেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোজ রোজ বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য, এর কারণ দু'টি ঃ এক. প্রচলিত সরকার-গুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে تقوى ও بر অর্থাৎ সৎ কর্ম ও আল্লাহ্-ভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করে—যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ! তারা যদিও এক-বার পরীক্ষার জন্যই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং আল্লাহ্র কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি, আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

দুই. জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধপ্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ —এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣

(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে

হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ্ করেছ সেটা ছাড়া। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়—এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম। অতএব, যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহ্র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের জন্য (এ সব জন্তু ইত্যাদি) হারাম করা হয়েছে, মৃত জন্তু, (যা যবেহ্ করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই মরে যায়) এবং রক্ত (যা প্রবাহিত হয়) এবং শূকরের মাংস (শূকরের অন্যান্য অংশও) এবং যে জন্তু (নৈকট্য লাভের অভিপ্রায়ে) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য নামে উৎসর্গকৃত হয় এবং যা কণ্ঠরোধে মারা যায় এবং যা আঘাত লেগে মারা যায় এবং যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায় (উদাহরণত পাহাড় থেকে পড়ে অথবা কূপে পড়ে) এবং যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু (ধরে) ভক্ষণ করতে থাকে এবং (এ কারণে মারা যায়) কিন্তু (কণ্ঠরোধে মৃত থেকে নিয়ে হিংস্র জীব ভক্ষণ পর্যন্ত বর্ণিত জন্তুসমূহের মধ্য থেকে) যেটাকে তোমরা (প্রাণ বের হওয়ার পূর্বে) শরীয়তের নিয়মানুযায়ী যবেহ্ করতে পার (তা তোমাদের জন্য হালাল হবে) এবং (এছাড়া হারাম করা হয়েছে) যে জন্তু (আল্লাহ্ ছাড়া) অন্যের যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয় (যদিও মুখে অন্যের নামে উৎসর্গ করা না হয় কেননা, বদনিয়তের উপরই হারাম হওয়া নির্ভরশীল। বদনিয়ত কখনও কথায় প্রকাশ পায়; যেমন অন্যের নামে উৎসর্গ করে দিলে, আবার কখনও কাজে প্রকাশ পায়; যেমন অন্যের যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করলে) এবং (গোশ্ত ইত্যাদি) যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহ্ (এবং হারাম)। অদ্য (অর্থাৎ এখন) কাফিররা তোমাদের ধর্ম থেকে (অর্থাৎ ইসলাম পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এরূপ ধারণা থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে (কেননা, ইসলাম মাশ-আল্লাহ্ খুব প্রসার লাভ করেছে)। অতএব তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ভয় করো না (যে, তোমাদের দীনকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে) এবং আমাকে ভয় কর (অর্থাৎ আমার বিধি-বিধান অমান্য করো না)। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (সর্ব-প্রকারে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম (শক্তির দিক দিয়েও। ফলে কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে এবং বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির দিক দিয়েও) এবং (এ পূর্ণাঙ্গ করার মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম (ধর্মীয় অবদানও—ফলে বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে এবং জাগতিক অবদানের ক্ষেত্রেও শক্তি অর্জিত হয়েছে।) এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হওয়ার জন্য (চিরতরে) মনোনীত করলাম। (অর্থাৎ ইসলামই কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের দীন থাকবে। একে রহিত করে অন্য ধর্ম মনোনীত করা হবে না। সুতরাং তোমাদের উচিত আমার অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ ধর্মে পুরোপুরি কায়েম

থাকা)। অতএব, (উল্লিখিত বস্তুগুলো যে হারাম, তা জেনে নেওয়ার পর আরও জেনে নাও যে,) যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে (এবং এ কারণে উল্লিখিত হারাম বস্তু খেয়ে ফেলে) কিন্তু কোন গোনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা না থাকে (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় না এবং আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেও খায় না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুটি غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, (যদি প্রয়োজনের পরিমাণ অনুমান করতে ভুল হয় এবং এক-আধ লোকমা বেশীও খেয়ে ফেলে) করুণাময় (কেননা, অপারক অবস্থায় ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর মাংস মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর, যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বোঝানো হয়েছে, যা যবেহ্ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এ ধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন—একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। ---(মসনদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারে কুতনী, বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কোরআনের অন্য আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا বলায় বোঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা-ই হারাম; সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বোঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ, ঐ জন্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদিও যবেহ্‌র সময়ও অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে যবেহ্ করতো। অধুনা কোন কোন

মূর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ্ করে। যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফিকহ্বিদরা একেও وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চমতম منخنقة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ— موقوذة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। منخنقة এবং ميتة উভয়টি موقوذة তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহিলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েয মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে পারি কি না? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সেই অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা موقوذة -এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলীতে মরে যায়, ফিকহ্বিদগণ সেটাকেও موقوذة -এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলতেন ঃ المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة -- অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তা-ই موقوذة -অতএব হারাম। (জাস্সাস)। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) শাফেয়ী, মালেকী প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। —(কুরতুবী)

সপ্তম— متردية অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালান অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নীচে পড়ে গিয়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা

مُتَرَدِّيَةٌ—এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন পাখীকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায় তবে সেটা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে! —(জাস্‌সাস)

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) এ বিষয়বস্তুটি রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। —(জাস্‌সাস)

অষ্টম— نَطِيحَةٌ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম, ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়।

উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ—অর্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে।

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ্ করার সম্ভাবনা নেই এবং শূকর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যবেহ্ করা না করা—উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটির ব্যাপারে নয়—পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্ বলে যবেহ্ করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম—ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্ করা হয়। 'নুছুব' ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহিলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কুরবানী করত। এটাকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

জাহিলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সর্বপ্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ— اِسْتِقْسَامٌ بِالْأَزْلَامِ হারাম। اَزْلَامِ—শব্দটি زَلَم এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহিলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে نعم (হাঁ) একটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা

উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদিম তুন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে এলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ্ করে তার মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে ভাগ করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী মাংস পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলিমরা বলেন ঃ ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব استقسام بالازلام এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

استقسام بالازلام শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কোরআন পাক একে ميسر নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও শা'বী বলেন ঃ আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত, পারস্য ও রোমেও তেমনি দাবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হত। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে অংশ নির্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। ---(মাযহারী)

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ ذَالِكُمْ فِسْقٌ

—অর্থাৎ এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ○

অর্থাৎ অদ্য কাফিরেরা তোমাদের দীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহ্কে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বছরের বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলে ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে ঃ ইতিপূর্বে কাফিররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা যেন তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজন-বিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের 'জবলে-রহমত' (রহমতের পাহাড়)-এর কাছে। এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আসরের পর—যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষত শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দোয়া কবুলের সময়।

হজ্জের জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কিরাম উপস্থিত। রাহামাতুল্লিল-আলামীন সাহাবায়ে কিরামের সাথে জবলে-রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্র আম্বার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্জের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত।

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লেখিত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে-কিরাম বর্ণনা করেন ঃ যখন হযরত রসূলে করীম (সা)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রী ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এ আয়াত কোরআনের শেষ দিক-কার আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এর পর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রসূলে করীম (সা) ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে। এর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোল কলায় পূর্ণ করে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ)-এর আমল থেকে যে সত্য ধর্ম ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নিয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল আজ যেন সেই ধর্ম ও নিয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হল।

এতে যেমন সব নবী ও রসূলের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌভাগ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি সাথে সাথে সব উম্মতের বিপরীতে তাঁর উম্মতেরও বিশেষ স্বাতন্ত্র্য-মূলক মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এ কারণেই একবার কতিপয় ইহুদী আলিম হযরত ফারুক (রা)-এর কাছে এসে বললেনঃ আপনাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত আছে, যা ইহুদীদের প্রতি অবতীর্ণ হলে তারা অবতরণের দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসাবে উদ্‌যাপন করত। ফারুকে আযম প্রশ্ন করলেনঃ আপনাদের ইঙ্গিত কোন্ আয়াতটির প্রতি? তারা উত্তরে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

হযরত ফারুকে আযম (রা) বললেনঃ হ্যাঁ আমরা জানি এ আয়াতটি কোন্ জায়গায়, কোন্ দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এ দিনটি ছিল আমাদের জন্য একসাথে দু'টি ঈদের দিন। একটি আরাফা ও অপরটি জুম্‌আ।

ঈদ ও উৎসবপর্ব উদ্‌যাপনের ইসলামী মূলনীতিঃ ফারুকে আযম রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উত্তরে একটি ইসলামী মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। এ মূলনীতিটি বিশ্বের সব জাতি ও ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। বিশ্বের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই নিজ নিজ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। এসব দিন তাদের কাছে ঈদ অথবা উৎসবপর্বের মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে।

কোথাও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম অথবা মৃত্যু অথবা সিংহাসনারোহণ দিবস পালন করা হয় এবং কোথাও কোন বিশেষ দেশ অথবা শহর বিজয় অথবা কোন মহান ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। ইসলাম মূর্খতা যুগের যাবতীয় রীতিপ্রথা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্মৃতি পরিত্যাগ করে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করার নীতি অবলম্বন করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'খলীলুল্লাহ্' উপাধি দান করা হয়েছে। কোরআন পাক— وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ বলে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা ও তাতে তাঁর সাফল্যের প্রশংসা করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়নি এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) ও তদীয় জননীর জন্ম ও মৃত্যুদিবস অথবা কোন স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়নি।

হ্যাঁ, তাঁর কাজকর্মের মধ্যে যেসব বিষয় ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল,

সেগুলোর শুধু স্মৃতিই সংরক্ষিত রাখা হয়নি, বরং সেগুলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ধর্মের অঙ্গ তথা ফরয-ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। কুরবানী, খতনা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়াদৌড়ি, মিনার তিন জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ—এগুলো সবই তাঁদের ক্রিয়াকর্মের স্মৃতি যা তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় নফ্সের কামনা-বাসনা ও স্বভাবজাত দাবী পিষ্ট করে সম্পাদন করেছিলেন। এসব ক্রিয়াকর্ম প্রতি যুগের মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করে দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

এমনিভাবে ইসলামে যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তাঁর জন্মমৃত্যু অথবা ব্যক্তিগত কোন সাফল্যের স্মৃতিতে দিবস পালন করার পরিবর্তে তাঁর ক্রিয়াকর্মের দিবস পালন করা হয়েছে। তাও আবার কোন বিশেষ ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন শবে-বরাত, রমযানুল-মুবারক, শবে-ক্বদর, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি। ঈদ মাত্র দুইটি—তাও খাঁটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত করা হয়েছে। প্রথম ঈদ পবিত্র রমযানের শেষে এবং হজ্জের মাসগুলোর প্রারম্ভে এবং দ্বিতীয় ঈদ পবিত্র হজ্জব্রত সমাপনান্তে রাখা হয়েছে।

মোট কথা, হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর উপরোক্ত উত্তর থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের ন্যায় আমাদের ঈদ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুগামী নয় যে, যেদিনই কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিনকেই আমরা ঈদ দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করব। প্রাচীন জাহিলিয়াতের যুগে এ প্রথাই প্রচলিত ছিল। আজকালকার আধুনিক জাহিলিয়াতও এ প্রথাটিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি অন্যান্য জাতির অনুকরণে মুসলমানরাও এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র জন্মদিবসে 'ঈদে-মীলাদ' উদ্‌যাপন করে। তাদের দেখে কিছু সংখ্যক মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মদিবসে 'ঈদে-মীলাদুন্নবী' নামে একটি নতুন ঈদ উদ্ভাবন করেছে। এ দিবসে বাজারে মিছিল বের করা, তাতে বাজে ও অশালীন কর্মকাণ্ড করা এবং রাতে আলোকসজ্জা করাকে তারা ইবাদত মনে করে থাকে। অথচ সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষীদের কাজেকর্মে এর কোন মূল খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃত সত্য এই যে, যেসব জাতি প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর কীর্তির দিক দিয়ে কাঙাল, তাদের মধ্যে এসব দিবস পালনের রীতি প্রচলিত হতে পারে। সুবেধন নীল-মণির মত তাদের দু'চারটি ব্যক্তিত্ব এবং তাদের বিশেষ কীর্তিকেই স্মৃতিদিবস হিসাবে পালন করাকে তারা জাতীয় গৌরব বলে মনে করে।

ইসলামে এরূপ দিবস পালনের প্রথা চালু হলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও অধিক পয়গম্বর রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই শুধু জন্ম নয়—বিস্ময়কর কীর্তিসমূহেরও দীর্ঘ তালিকা রয়েছে—এসবেরও দিবস পালন করা উচিত। পয়গম্বরদের পর শেষ নবী (সা)-র পবিত্র জীবনালেখ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিনই অক্ষয় কীর্তিতে ভাস্বর হওয়ার কারণে তা পালন করা দরকার। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যেসব প্রতিভা ও কীর্তির কারণে তিনি সমগ্র আরবে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, সেগুলো কি স্মৃতি উদ্‌যাপনের যোগ্য নয়? এরপর রয়েছে কোরআন অবতরণ, হিজরত, বদর যুদ্ধ, ওহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, তাবুক ও রসূলুল্লাহ্

(সা)-এর অন্যান্য যুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে একটিও এমন নয় যে, তার স্মৃতি উদ্‌যাপন না করলে চলে। এমনিভাবে তাঁর হাজার হাজার মো'জেযাও স্মৃতি উদ্‌যাপনের দাবী রাখে। সত্য বলতে কি, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে হযরত (সা)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর পবিত্র জীবনের প্রত্যেক দিন নয়—প্রত্যেক মুহূর্তই স্মৃতি উদ্‌যাপনের যোগ্যতা রাখে।

হযরত (সা)-এর পর তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবী রয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁর অনুপম জীবন যাত্রার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁদের স্মৃতি উদ্‌যাপন না করলে তা অবিচার হবে না কি? একবার এ প্রথা চালু হয়ে পড়লে সাহাবায়ে কিরাম মুসলিম মনীষীবৃন্দ, আল্লাহ্‌র ওলীগণ, ওলামা ও মাশায়েখ—যাঁদের সংখ্যা কয়েক কোটি হবে, স্মৃতি উদ্‌যাপনের তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা হবে না কি? পক্ষান্তরে যদি স্থিরীকৃত হয় যে, সবারই স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপন করা হবে, তবে সারা বছরের একটি দিনও স্মৃতি উদ্‌যাপন থেকে মুক্ত থাকবে না। বরং প্রতিদিনের প্রতি ঘন্টায় কয়েকটি স্মৃতি ও কয়েকটি ঈদ উদযাপন করতে হবে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম এ প্রথাকে জাহিলিয়াতের প্রথা আখ্যা দিয়ে বর্জন করেছেন। হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর উক্তিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এবার আলোচ্য আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য শুনুন ঃ এতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ এক, দীনের পূর্ণতা, দুই, নিয়ামতের সম্পূর্ণতা এবং তিন, ইসলামী শরীয়ত নির্বাচন।

দীনের পূর্ণতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ আজ সত্য দীনের যাবতীয় ফরয-সীমা, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পূর্ণ করে দেওয়া হলো। এখন এতে কোনরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা এবং হ্রাস করার সম্ভাবনা বাকী নেই। —(রূহুল-মা'আনী) এ কারণেই এ আয়াত অবতরণের পর কোন নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। যে কয়েকখানি আয়াত এরপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা হয় উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সম্বলিত, না হয় পূর্ববর্ণিত বিধি-বিধানের তাকীদ সম্বলিত।

তবে ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে মুজতাহিদ ইমামরা যদি নতুন নতুন ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রকাশ করেন, তবে তা উপরোক্ত বর্ণনার পরিপন্থী নয়। কেননা, কোরআন পাক যেমন বিধি-বিধানের সীমা, ফরয ইত্যাদি বর্ণনা করেছে, তেমনি ইজতিহাদের মূলনীতির ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান প্রকাশ করা হবে, তা একদিক দিয়ে কোরআনেরই বর্ণিত বিধি-বিধান। কেননা, এগুলো কোরআন বর্ণিত মূলনীতির অধীন।

সার কথা দীনের পূর্ণতার অর্থ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী এই যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এতে কোনরূপ

পরিবর্ধনের আবশ্যকতা নেই এবং রহিত হয়ে কম হওয়ারও আশংকা নেই। কেননা, এর পরেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সাথে সাথে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর ওহী ছাড়া কোরআনের কোন নির্দেশ রহিত হতে পারে না। তবে ইজতিহাদের মূলনীতির অধীনে মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে যে বাহ্যিক পরিবর্ধন হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ধন নয়; বরং কোরআনী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মাত্র।

নিয়ামত সম্পূর্ণ করার অর্থ মুসলমানদের প্রাধান্য ও উত্থান এবং বিরুদ্ধবাদীদের পরাভূত ও বিজিত হওয়া। মক্কা বিজয়, মূর্খতা যুগের কু-প্রথার অবলুপ্তি এবং সে বছর হজ্জে কোন মুশরিকের যোগদান না করার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ লাভ করে।

এখানে কোরআনের ভাষায় এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আয়াতে دين -এর সাথে اكمال শব্দটি এবং نعمت-এর সাথে اتمام শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ اكمال ও اتمام উভয়টিকে বাহ্যত সম-অর্থবোধক মনে করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যা 'মুফরাদাতুল-কোরআন' গ্রন্থে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ কোন বস্তুর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বলা হয় تكميل ও اكمال এবং এক বস্তুর পর অন্য বস্তুর আবশ্যকতা ফুরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় اتمام সুতরাং دين اكمال—এর সারমর্ম এই যে, এ জগতে আল্লাহ্র আইন ও ধর্মের বিধি-বিধান প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ পূর্ণ করে দেওয়া হল এবং اتمام نعمت -এর অর্থ এই যে, এখন মুসলমানরা কারও মুখাপেক্ষী নয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রাধান্য, শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, যদ্দ্বারা তারা সত্য ধর্মের বিধি-বিধানকে কার্যকরভাবে জারি ও প্রয়োগ করতে পারে।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে دين—কে মুসলমানদের দিকে সম্বন্ধ করে دينكم বলা হয়েছে এবং نعمت -কে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করে نعمتى বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, دين বা ধর্ম মুসলমানদের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে এবং نعمت সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্ণত্ব লাভ করে। (ইবনে কাইয়্যেম—তফসীর আল-কাইয়্যেম)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, অদ্য দীনের পূর্ণতা লাভের অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ধর্ম অপূর্ণ ছিল। বাহ্রে-মুহীত গ্রন্থে কাফফাল মরওয়াযীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী ও রসূলের ধর্মই তাঁর যমানা হিসাবে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ যে যুগে যে পয়গম্বরের প্রতি কোন শরীয়ত বা ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ যুগ ও ঐ জাতি হিসাবে সে ধর্মই ছিল পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ কথা ছিল যে, এ জাতি ও এ যুগের জন্য যে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ, পরবর্তী যুগ ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের জন্য সে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হবে না; বরং এ ধর্মকে

রহিত করে অন্য ধর্ম ও শরীয়ত প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এর ব্যতিক্রম। এ শরীয়ত সর্বশেষ যুগে নাযিল হওয়ার কারণে সব দিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন বিশেষ যুগ, বিশেষ ভূখণ্ড অথবা বিশেষ জাতির সাথে এর সম্পর্ক নেই; বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক জাতির জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় পুরস্কার এই যে, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন, যা সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যাতে পারলৌকিক মুক্তি সীমাবদ্ধ।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম একটি বড় অবদান এবং এ ধর্মটিই সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ। এরপর নতুন কোন ধর্ম আগমন করবে না এবং এতে কোনরূপ সংযোজন-বিয়োজনও করা হবে না।

এ কারণেই আয়াতটি অবতরণের সময় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু হযরত ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আপনি এ নশ্বর পৃথিবীতে আর বেশীদিন অবস্থান করবেন না। কেননা, দীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রসূলের প্রয়োজনও মিটে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এ বক্তব্যের সত্যতা সমর্থন করেন।—(ইবনে কাসীর, বাহরে-মুহীত) সেমতে পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে, এর মাত্র একাশি দিন পর হযরত (সা) ইহজগৎ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ—আয়াতের শেষাংশের এ বাক্যটি শুরু ভাগে বর্ণিত হারাম জন্তুসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বাক্যের উদ্দেশ্য একটি সাধারণ নিয়ম থেকে একটি বিশেষ অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে যদি উল্লিখিত হারাম বস্তুর কিছু অংশ খেয়ে জঠর জ্বালা নিবৃত্ত করে, তবে তার কোন গোনাহ্ নেই। কিন্তু এর জন্য শর্ত এই যে, উদর পূর্তি করা ও স্বাদ উপভোগ করাই যেন উদ্দেশ্য না হয়। বরং যতটুকুতে ক্ষুধার অস্থিরতা দূর হয় ততটুকুই খাওয়া উচিত।

আয়াতে غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ—বাক্যাংশের উদ্দেশ্য তাই যে, এ খাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়া উচিত নয়; বরং শুধু ক্ষুধার অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্য থাকা উচিত। অবশেষে فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এসব হারাম জন্তু ক্ষুধার তাড়নার সময়ও হারামই থাকে, তবে অস্থিরতার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(৪) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল? বলে দিনঃ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে হালাল ও হারাম জন্তুর বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিকারী কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আয়াতে তারই উত্তর বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, (কুফর ও বাজপাখীর শিকার করা জন্তুর মধ্যে) কোন্ কোন্টি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? (অর্থাৎ যেসব শিকার করা জন্তু যবেহ করলে হালাল হয়ে যায়, কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করলেও কি সেগুলো সব হালাল থাকে, না তন্মধ্যে কিছু বিশেষ জন্তু হালাল থাকে, না কোন অবস্থাতেই হালাল থাকে না? আর যেসব জন্তু হালাল হয়, সেগুলোর জন্যও কোন শর্ত আছে কি না?) আপনি (উত্তরে) বলে দিনঃ তোমাদের জন্য সব হালাল জন্তু (অর্থাৎ শিকার জাতীয় যেসব জন্তু পূর্ব থেকে হালাল, কুকুর ও বাজপাখী দ্বারা শিকার করলেও সেগুলো সবই) হালাল রাখা হয়েছে। (এটি প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর। অতঃপর দ্বিতীয় অংশের উত্তর এই যে, কুকুর ও বাজপাখীর শিকার হালাল হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তা এই যে,) যেসব শিকারী জন্তুকে (উদাহরণত কুকুর, বাজ ইত্যাদিকে) তোমরা (বিশেষভাবে—যা পরে বর্ণিত হচ্ছে) প্রশিক্ষণ দান কর (এটি প্রথম শর্ত) এবং তোমরা তাদের শিকারের লক্ষ্যে প্রেরণ কর (এটি দ্বিতীয় শর্ত) এবং তাদের (যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা পূর্বে বলা হয়েছে) ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (শরীয়তে) শিক্ষা দিয়েছেন। (এ প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এই যে, কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে—যাতে সে শিকার ধরে নিজে না খায় এবং বাজপাখীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে—যাতে ডাকা মাত্রই সে শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে

থাকলেও তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। এটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রথম শর্ত।) অতএব, এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও। (এটি তৃতীয় শর্ত। এর লক্ষণাদি প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব কুকুর যদি নিজে শিকারকে খেতে থাকে অথবা বাজপাখী ডাকে ফিরে না আসে, তবে বুঝতে হবে যে, জন্তুটি যখন মালিকের বশ হয়নি, তখন শিকারও মালিকের জন্য করেনি, বরং নিজে খাওয়ার জন্য করেছে) এবং (যখন শিকারের প্রতি শিকারী জন্তুকে প্রেরণ করতে থাক, তখন) তার (অর্থাৎ জন্তুর উপর প্রেরণ করার সময়) আল্লাহ্‌র নামও লও (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে প্রেরণ কর---এটি চতুর্থ শর্ত) এবং (সব ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। উদাহরণত শিকারে এমনভাবে মনোনিবেশ করো না যাতে নামায ইত্যাদির ব্যাপারেও উদাসীন হয়ে পড় কিংবা এতদূর লোভী হয়ো না যে, হালাল হওয়ার শর্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই শিকার করা জন্তু খেয়ে ফেল।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে—নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপাখীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরত আসার জন্য ডাক দেওয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে---যদিও তখন কোন শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্য শিকার করে; নিজের জন্য নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরত না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়, আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مكلبين শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تكليب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা দেওয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেওয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন-এর গ্রন্থকার مكلبين শব্দের ব্যাখ্যায় ارسال শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না ; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে, যবেহ্ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ্ ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে একটি পঞ্চম শর্তও রয়েছে। তা এই যে, শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। جوارح শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যে সব বন্য জন্তু করতলগত নয়, উপরোক্ত মাস'আলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, নিয়মিত যবেহ্ করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهٗ ۠ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

---

(৫) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল ; আহ্লে-কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য হালাল সতীসাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতীসাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে যখন তোমরা মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্য, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আজ (তোমাদের প্রতি যেমন ধর্মীয় চিরস্থায়ী পুরস্কার অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে, তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য জাগতিক পুরস্কারও তোমাদের দান করা হয়েছে যে,) তোমাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ (যা ইতিপূর্বে হালাল করা হয়েছিল, চিরকালের জন্য) হালাল রাখা হল (অর্থাৎ তা আর কখনও রহিত হবে না) এবং যারা (তোমাদের পূর্বে ঐশী) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান) তাদের যবেহ্ করা জন্তু (ও) তোমাদের জন্য হালাল এবং (এর হালাল হওয়া এমনি নিশ্চিত, যেমন) তোমাদের যবেহ্ করা জন্তু তাদের জন্য হালাল এবং সতীসাধ্বী মহিলারাও যারা মুসলমান (তোমাদের জন্য হালাল) এবং (মুসলমান মহিলাদের হালাল হওয়া যেমন নিশ্চিত, তেমনি) তোমাদের পূর্বে যারা (ঐশী) গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে সতীসাধ্বী মহিলাও (তোমাদের জন্য হালাল) যখন তোমরা তাদের বিনিময় প্রদান কর। (অর্থাৎ মোহরানা দেওয়া শর্ত না হলেও ওয়াজিব। উল্লেখিত যেসব মহিলা হালাল করা হয়েছে, তা) এভাবে যে, তোমরা (তাদের) স্ত্রী কর (অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর। এর শর্তাবলী শরীয়তে সুবিদিত) প্রকাশ্যে ব্যভিচার করবে না এবং গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হবে না। (এসব শরীয়তের বিধি-বিধান। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয)। এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিশ্বাস করবে (উদাহরণত অকাট্য হালাল বস্তুর হালাল হওয়া এবং অকাট্য হারাম বস্তুর হারাম হওয়াকে অবিশ্বাস করবে) তার (প্রত্যেক সৎ) কর্ম বিনষ্ট (ও বৃথা) হবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুতরাং হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত জন্তু ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ —অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হল। 'আজ' বলে ঐ দিনকে বোঝানো হয়েছে যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থায়ী-ভাবে হালাল রাখা হল। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে طيبات অর্থাৎ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ——অর্থাৎ আল্লাহ্ হালাল করেন তাদের জন্য طيبات এবং হারাম করেন خبائث এখানে طيبات -এর বিপরীতে خبائث ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طيبات পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خبائث নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়।

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে ঃ بَلْ هُمْ أَضَلُّ——অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানবচরিত্র প্রভাবান্বিত হয় তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই কোরআন পাক বলে ঃ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَاعْمَلُوا صَالِحًا——এখানে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

বিশেষ করে মাংস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে মাংস চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোট কথা أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ বাক্যটিতে হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন্ কোন্ বস্তু طيبات অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও কাম্য এবং কোন্ কোন্ বস্তু خبائث অর্থাৎ নোংরা, ক্ষতিকর ও ঘৃণার্হ, তা সুস্থ রুচি-জ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যে সব জন্তুকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতি যুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃণার্হ মনে করে এসেছে। যেমন মৃত জন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভাল ও মন্দের পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন কোন বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে পয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্য অকাট্য দলীল-স্বরূপ। কেননা মানুষের মধ্যে পয়গম্বরই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে তাদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের চারদিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাঁদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে নোংরা আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে নোংরা এবং যে সব বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব নূহ (আ)-এর আমল থেকে শেষ নবী (সা)-র আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভাবসম্পন্ন মনীষীরা এগুলোকে নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগা' গ্রন্থে বলেন,— ইসলামী শরীয়তে হারামকৃত জন্তুগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দুটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর যবেহ্ পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে সেটাকে যবেহ্ করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শূকর

প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাক وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবিত্র জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর শূকরের মাংস, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিত্র বস্তুসমূহের বর্ণনা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি জন্তু বিশেষের خبيث তথা নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ কোন জাতিকে শাস্তি হিসাবে কোন জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় যে, জন্তুটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহ্র গযবে পতিত, তাদেরকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত কোরআনে বলা হয়েছেঃ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ —অর্থাৎ কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসাবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব বোঝা যায় যে. এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণীভুক্ত। নিয়মিত যবেহ্ করলেও এগুলো হালাল হবে না। এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলোর নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণত হিংস্র জন্তু। অন্যান্য জন্তুকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-খামচে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ।

এ কারণেই একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) বাঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেনঃ কোন মানুষ একে খেতে পারে কি? এমনিভাবে অনেক জন্তু রয়েছে, কষ্ট দেওয়া এবং বিভিন্ন বস্তু ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া তাদের অভ্যাস। যেমন সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি, মাছি, চিল, বাজ ইত্যাদি।

এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সাধারণ নীতি হিসাবে বর্ণনা করেন যে, দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খায় এমন প্রত্যেক হিংস্র জন্তু যেমন সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং নখ দ্বারা শিকার করে এমন প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল ইত্যাদি সবই হারাম। এছাড়া ইঁদুর, মৃতভোজী জন্তু, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

মোট কথা এই যে, ইসলামী শরীয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তুর মধ্যেও প্রকৃতিগতভাবে নোংরামি পরিলক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোন নোংরামি নেই; কিন্তু জন্তু যবেহ্ করার যে পদ্ধতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন, সেটাকে সে পদ্ধতিতে যবেহ্ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারেঃ এক. মূলত যবেহ্ করা হয়নি। যেমন হেঁচকা টানে মেরে ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। দুই. যবেহ্ করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম

নিয়ে। তিন. কারও নাম নেওয়া হয়নি এবং যবেহ্ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় নি। এরূপ যবেহ্ শরীয়তে ধর্তব্য নয়, বরং যবেহ্ ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানুষ আল্লাহ্প্রদত্ত নিয়ামত পানাহার করে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার ছাড়া অন্য কোন বস্তু পানাহারের সময় এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই যে, 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'বিসমিল্লাহ্' বলেই পানাহার করতে হবে---নতুবা হালাল হবে না। বড়জোর প্রত্যেক বস্তু পানাহারের সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলা মোস্তাহাব। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তখন আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলে জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর রহস্য কি?

চিন্তা করলেই পার্থক্যটি ফুটে ওঠে। প্রাণীদের প্রাণ এক দিক দিয়ে সব সমান। তাই এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করবে এবং যবেহ করে খেয়ে ফেলবে, বাহ্যত তা বৈধ হওয়া সমীচীন নয়। এখন যাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এটি একটি বিরাট নিয়ামত বলতে হবে। অতএব, জন্তু যবেহ করার সময় কল্পনায় এ নিয়ামতের উপলব্ধি ও শোকর আদায়কে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, দানা, ফল ইত্যাদি এর বিপরীত। এগুলো সৃজিতই হয়েছে যাতে মানুষ এগুলোকে কেটে-পিষে স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাই, শুধু বিসমিল্লাহ্ বলা মোস্তাহাব পর্যায়ে রাখা হয়েছে---ওয়াজিব বা জরুরী করা হয়নি।

এর আরও একটি কারণ এই যে, মুশরিকরা জন্তু যবেহ্ করার সময় দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতো। এ প্রথা জাহিলিয়াত যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলামী শরীয়ত তাদের এই কাফিরসুলভ প্রথাকে একটি চমৎকার ইবাদতে রূপান্তরিত করে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। ভ্রান্ত নামের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নাম প্রস্তাব করাই ছিল এ মুশরিকসুলভ প্রথা মিটাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। নতুবা প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস পরিত্যক্ত হওয়া ছিল সুকঠিন।

এ পর্যন্ত আয়াতের প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা বর্ণিত হল। দ্বিতীয় বাক্য এই ঃ

—وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে-কিতাবদের জন্য হালাল।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে 'খাদ্য' বলতে যবেহ করা জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্, সুদ্দী, যাহ্হাক, মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। (রূহুল-মা'আনী, জাস্সাস) কেনানা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহ্লে-কিতাব, মূর্তিউপাসক, মুশরিক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ্ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে, যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্য খাওয়া হালাল।

অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু আহ্‌লে-কিতাবদের জন্য হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় আহ্‌লে-কিতাব কারা? কিতাব বলে কোন্ কিতাবকে বোঝানো হয়েছে? আহ্‌লে-কিতাব হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কি না? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিত পাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে. এখানে ঐসব ঐশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌র কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বলে মনে করে, তারাই আহ্‌লে-কিতাব। পক্ষান্তরে যা আল্লাহ্‌র কিতাব বলে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নিশ্চিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেরূপ কোন কিতাবের অনুসারীরা আহ্‌লে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরিক, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খৃস্টান জাতিই আহ্‌লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'সাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত। যেসব আলিমের মতে যারা দাউদ (আ)-এর যবূরের প্রতি ঈমান রাখেন, তাঁরা তাদেরও আহ্‌লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি,---তাঁরা এদের মূর্তি ও অগ্নি-উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোট কথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহ্‌লে-কিতাব বলা যায় তারা হল ইহুদী ও খৃস্টান জাতি। তাদের যবেহ্ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু তাদের জন্য হালাল।

এখন দেখতে হবে, ইহুদী ও খৃস্টানদের আহ্‌লে-কিতাব মনে করার জন্য এরূপ কোন শর্ত আছে কি না যে, প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জীল অনুযায়ী বিশুদ্ধ আমল করতে হবে, না বিকৃত তওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারী এবং ঈসা ও মরিয়ম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্তকারীরাও আহ্‌লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে? কোরআন পাকের অসংখ্য বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আহ্‌লে-কিতাব হওয়ার জন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হওয়ার দাবীদার হওয়াই যথেষ্ট---যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো পথভ্রষ্টতায় পতিত থাকে।

কোরআন পাক যাদের আহ্‌লে-কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে বারবার এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, এরা নিজেদের ঐশী গ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করে---يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ---এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করেছে।

قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ

এতদসত্ত্বেও যখন কোরআন তাদের আহ্‌লে-কিতাব বলেই আখ্যা দেয়, তখন বোঝা গেল যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ তারা আহ্‌লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত—বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ হোক না কেন।

ইমাম জাস্‌সাস 'আহ্‌কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেনঃ হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তওরাত পাঠ করে এবং ইহুদীদের শনিবারকে পবিত্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে? হযরত ফারুকে আযম (রা) উত্তরে লিখে পাঠালেনঃ তাদেরকে আহ্‌লে-কিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে।

ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়ঃ আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খৃস্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খৃস্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না; তওরাত ও ইঞ্জীলকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ বলে মনে করে না এবং মূসা ও ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদম শুমারীর নামের কারণে আহ্‌লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

খৃস্টানদের সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, তাদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল নয়। কেননা, খৃস্টধর্মের মধ্য থেকে একমাত্র মদ্যপান ব্যতীত আর কোন কিছুতেই তারা বিশ্বাসী নয়। তাঁর উক্তি এরূপঃ

روى ابن الجوزى بسنده عن على (رض) قال لاتأكلوا من ذبائح نصارى بنى تغلب فانهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيئ الا شربهم الخمر—ورواه الشافعى بسند صحيح عنه .

"ইবনুল-জওযী বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আলী (রা)-র উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বনী তাগলিবের খৃস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু খেয়ো না। কেননা, তারা খৃস্টধর্ম থেকে মদ্যপান ব্যতীত আর কোন কিছুই গ্রহণ করে নি। ইমাম শাফেয়ীও বিশুদ্ধ সনদসহ এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।"—(তফসীরে মাযহারী, ৩৪ পৃঃ, ৩য় খণ্ড, মায়েদা)

বনী তাগলিব সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-র এ কথাই জানা ছিল যে, তারা বেদীন—খৃস্টান নয়; যদিও খৃস্টান বলে কথিত হয়। তাই তিনি তাদের যবেহ্ করা জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর অনুসন্ধান অনুযায়ী তারাও সাধারণ খৃস্টানদের মত পুরোপুরিভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী নয়। তাই তাঁরা তাদের যবেহ্ করা জন্তুকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন।

و قال جمهور الامة ان ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب او غيرهم وكذلك اليهود -

"উম্মতের অধিক সংখ্যক আলিম বলেনঃ খৃস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল—সে খৃস্টান বনী তাগলিবেরই হোক; অথবা অন্য কোন গোত্রের ও দলের হোক। এমনিভাবে প্রত্যেক ইহুদীর যবেহ্ করা জন্তুও হালাল।"—(কুরতুবী, ৭৮ পৃঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

মোট কথা এই যে, যেসব খৃস্টান সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র নবী বলে স্বীকার করে না, তারা আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

'আহলে-কিতাবের খাদ্য বলে কি বোঝানো হয়েছে? طعام শব্দের আভিধানিক অর্থ খাদ্যদ্রব্য। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিমের মতে এ স্থলে طعام বলে শুধু আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা মাংসকে বোঝানো হয়েছে। কেননা মাংস ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আহ্লে-কিতাব ও অপরাপর কাফিরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শুকনো আহার্য বস্তু গম, ছোলা, চাল, ফল ইত্যাদি প্রত্যেক কাফিরের হাতের খাওয়াও হালাল। এতে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফিরদের বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরিক মূর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহ্লে-কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, অপবিত্রতার আশংকা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

মোট কথা, আহ্লে-কিতাব ও অন্যান্য কাফিরের খাদ্যদ্রব্যে শরীয়তানুযায়ী যে পার্থক্য হতে পারে, তা শুধু তাদের যবেহ্ করা মাংসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ কারণে আলোচ্য আয়াতে সর্বসম্মতভাবে আহ্লে-কিতাবদের খাদ্য বলে তাদের যবেহ্ করা জন্তু বোঝানো হয়েছে। তফসীরবিদ কুরতুবী লিখেনঃ

والطعام اسم يؤكل والذبائح منه وهو ههنا خاص بالذبائح عند كثير من اهل العلم بالتاويل واما ما حرم من طعامهم فليس بداخل في عموم الخطاب -

طعام শব্দটি প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যবেহ্ করা মাংসও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতে طعام শব্দটি অধিকাংশ আলিমের মতে বিশেষভাবে যবেহ্ করা জন্তুর ব্যাপারেই বলা হয়েছে। আহ্লে-কিতাবদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যেগুলো মুসলমানদের জন্য হারাম করা হয়েছে, সেগুলো আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়।—

(কুরতুবী, ৭৭ পৃঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এরপর ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কিত আরও বিবরণ বর্ণনা করেছেনঃ

لا خلاف بين العلماء ان ما لا يحتاج الى ذبح كالطعام الذى لا معالجة فيه كالفاكهة والبر - جائز اكله ان لا يضر فيه تملك احد والطعام الذى تقع فيه المعالجة على ضربين احدهما ما فيه معالجة صنعة لا تعلق لها بالدين كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه - فهذا ان تجنب من الذمى فعلى وجه التقذر - والضرب الثانى التزكية التى ذكرنا انها هى التى تحتاج الى الدين والنية - فلما كان القياس ان لا تجوز ذبائحهم كما نقول انهم لا صلوة لهم ولا عبادة مقبولة له رخص الله تعالى فى ذبائحهم على هذه الأمة واخرجها النص من القياس على ما ذكرنا من قول ابن عباس -

"আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, সেসব খাদ্যদ্রব্য, যেগুলো তৈরী করতে যবেহ্ করতে হয় না—যেমন, ফল, গমের আটা ইত্যাদি—এগুলো খাওয়া জায়েয। কেননা, যে কেউ এগুলোর মালিক হয়, তাতে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। তবে ঐসব খাদ্য, যাতে মানুষের কিছু কাজ করতে হয়, সেগুলো দুই প্রকার। যাতে এমন কাজ করতে হয়, যার ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণত আটা দিয়ে রুটি তৈরী করা, যয়তুন থেকে তেল বের করা ইত্যাদি। এগুলো খাওয়া জায়েয। কাফির ও যিম্মীর এমন খাদ্য থেকেও যদি কেউ বেঁচে থাকতে চায়, তবে তা হবে রুচির ব্যাপার। দুই,—ঐ খাদ্য, যাতে যবেহ্ করার কাজ করতে হয়। এর জন্য ধর্ম ও নিয়ত প্রয়োজন। যদিও কিয়াসের দাবী ছিল এই যে, কাফিরের নামায ও ইবাদতের মত তার যবেহ্ করার কাজটিও কবূল না হওয়া উচিত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য বিশেষভাবে তাদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল করে দিয়েছেন। কোরআনের আয়াত বিষয়টি কিয়াসের ইখতিয়ার-বহির্ভূত করে দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এ উক্তিই আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।"---(কুরতুবী, ৭৭ পৃঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড) মোট কথা আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদ আলিমদের ঐকমত্যে আহ্লে-কিতাবদের খাদ্য বলে ঐ খাদ্যকে বোঝানো হয়েছে, যার হালাল হওয়া ধর্ম ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল—অর্থাৎ যবেহ্ করা জন্তু। এ কারণেই এ খাদ্যের ব্যাপারে আহ্লে-কিতাবদের সাথে স্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তারাও আল্লাহ্ প্রেরিত গ্রন্থ ও পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাসের দাবীদার। তবে তারা স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করে এ দাবীকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। ফলে শিরক ও কুফরের আবর্তে পতিত হয়েছে। কিন্তু মূর্তিপূজারী মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত। তাঁরা কোন ঐশী গ্রন্থ অথবা নবী-রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবীও করে না। তারা যেসব গ্রন্থ ও ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস রাখে, তা আল্লাহ্র গ্রন্থ নয় এবং তাদের নবী ও রসূল হওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার কোন উক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আহলে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণঃ এটি আলোচ্য

বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেওয়া হয় যে, কাফিরদের মধ্য থেকে আহ্‌লে-কিতাব ইহুদী ও খৃস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু'টি মাস'আলায় তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ্ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে।

এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিয়ে করা হারাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি-বিধান জরুরী।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য এরূপ ঃ

(وطعام اهل الكتاب) قال ابن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابراهيم النخعى والسدى ومقاتل بن حيان يعنى ذبائحهم حلال المسلمين لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس -

"ইবনে আব্বাস, আবূ উমামা, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, আতা, হাসান, মকহুল, ইবরাহীম, সুদ্দী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান (র) আহ্‌লে-কিতাবদের খাদ্যের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের যবেহ্ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য হালাল। কেননা, তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন নাম নিয়ে যবেহ্ করাকে হারাম মনে করে। তারা জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নাম উচ্চারণ করে না—যদিও তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব আজগুবী বিশ্বাস পোষণ করে, যা থেকে আল্লাহ্ পাক ও পবিত্র।"

—(ইবনে কাসীর)

ইবনে-কাসীরের এ বর্ণনা থেকে প্রথমত জানা গেল যে, উল্লেখিত সব সাহাবী ও তাবেয়ীনের মতে আয়াতে আহ্‌লে-কিতাবের খাদ্য বলে তাদের যবেহ্ করা জন্তুকেই বোঝানো হয়েছে এবং এটি যে হালাল, সে বিষয়ে উম্মতের সবাই একমত।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, তাঁদের মতে আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যবেহ্ করার মাস'আলাটি ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবেহ্ করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে। এটা ভিন্ন কথা যে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মুশরিকসুলভ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ আর মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌কে এক মনে করতে শুরু করেছে।

কোরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় তাদের এ গোমরাহী উল্লেখ করেছে ঃ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ - —"নিশ্চিতরূপেই তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তো মসীহ্ ইবনে মরিয়মই।"

এ আলোচনার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের যেসব আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবেহ্ করা জন্তু এবং আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ ছাড়া যবেহ্ করা জন্তুকে হারাম বলা হয়েছে, সেসব আয়াত যথাস্থানে অপরিবর্তনীয় ও কার্যকর রয়েছে। সূরা মায়েদার যে আয়াতে আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুকে হালাল বলা হয়েছে, সে আয়াতও উপরিউক্ত সূরাদ্বয়ের আয়াতসমূহ থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না। কেননা আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুকে হালাল বলার কারণও তাই যে, তাদের বর্তমান ধর্মেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তু এবং আল্লাহ্র নাম ছাড়া যবেহ্ করা জন্তু হারাম। বর্তমান যুগেও তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব কপি পাওয়া যায় তাতেও যবেহ্ ও বিয়ের বিধি-বিধান প্রায় তাই যা কোরআন ও ইসলামে আছে। এর বিস্তারিত উদ্ধৃতি পরে উল্লেখ করা হবে।

হ্যাঁ, এটা সম্ভব যে, কিছুসংখ্যক মূর্খ লোক এ ধর্মীয় নির্দেশের বিপরীতে অন্য কোন আমল করবে যেমন অনেক লেখাপড়া না-জানা মুসলমানের মধ্যেও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথা অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু এসব কুপ্রথাকে ইসলাম ধর্ম বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। খৃস্টানদের মূর্খ জনগণের কর্মপদ্ধতি দেখেই কোন কোন তাবেয়ী বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, খৃস্টানরা জন্তু যবেহ্ করার সময় কি কি করে—কেউ মসীহ্ অথবা উযায়েরের নাম উচ্চারণ করে, কেউ বিসমিল্লাহ্ না বলেই যবেহ্ করে। এরপরও যখন আল্লাহ্ তা'আলা আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল করেছেন, তখন বোঝা গেল যে, এ নির্দেশ সম্বলিত সূরা মায়েদার আয়াত আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুর পক্ষে সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের আয়াতসমূহকে প্রকারান্তরে রহিতই করে দিয়েছে, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্র নাম না নিয়ে যবেহ্ করাকে হারাম বলা হয়েছে।

কোন কোন বুযুর্গ আলিমের উক্তি থেকে জানা যায় যে, যেসব তাবেয়ী আহ্লে-কিতাবদের বিসমিল্লাহ্বিহীন যবেহ্ করা জন্তু এবং আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তুকে হালাল বলেছেন, তাঁদের মতেও আহ্লে-কিতাবদের আসল ধর্মমত ইসলামী ধর্মমত থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু তাদের মূর্খ জনগণই এসব ভুলভ্রান্তি করে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা মূর্খ আহ্লে-কিতাবদেরকে সাধারণ আহ্লে-কিতাব থেকে পৃথক করে দেখেন নি এবং যবেহ্ ও বিবাহের ব্যাপারে তাদের বেলায়ও ঐ নির্দেশই বলবৎ রেখেছেন, যা তাদের বাপ-দাদা ও আসল ধর্মমত অনুসারীদের বেলায় রেখেছেন। অর্থাৎ মূর্খ খৃস্টানদের যবেহ্ এবং তাদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয।

ইবনে আরাবী 'আহ্কামুল কোরআন' গ্রন্থে লেখেন ঃ আমি ওস্তাদ আবুল ফাতাহ

মাকদাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমান যুগের খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করে—উদাহরণত যবেহ্ করার সময় মসীহ্ অথবা উযায়েরের নাম উচ্চারণ করে। এমতাবস্থায় তাদের যবেহ্ করা জন্তু কিরূপে হালাল হতে পারে? আবুল ফাতাহ্ মাকদাসী বললেন ঃ

هم من ابائهم وقد جعلهم الله تعالى تبعا لمن كان قبلهم مع علمه بحالهم -

—"তাদের বিধান তাদের বাপ-দাদার মতই। (বর্তমান যুগের গ্রন্থধারীদের) এ অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার অনুরূপ করে দিয়েছেন।—(আহ্‌কামুল-কোরআন, ইবনে আরাবী, ২২৯ পৃঃ, ১ম খণ্ড)

মোট কথা, পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যারা আহ্‌লে-কিতাবদের আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহ্‌লে-কিতাবদের আসল মযহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তাঁরা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহ্‌লে কিতাবদের সাথে এক করে তাদের যবেহ্ করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামরা এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহ্‌লে-কিতাবদের মূর্খ জনগণ যে আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীতই যবেহ্ করে, তা যেমন ইসলামী বিধানের পরিপন্থী, তেমনি স্বয়ং খৃস্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী। এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত। তাঁরা ফয়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ্ করা জন্তু আয়াতে বর্ণিত 'আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।' সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের ভ্রান্ত কর্মের কারণে কোরআনের আয়াতে নস্‌খ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়।

এ কারণেই ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়্যান প্রমুখ তফসীরবিদ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের আয়াতসমূহে কোন নস্‌খ হয়নি এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত। ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وذهب الى ان الكتابى اذا لم يذكر الله على الذبيحة وذكر غير الله لم تؤكل وبه قال ابو الدرداء وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة - وبه قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر ومالك وكره النخعى والثورى اكل ما ذبح واهل به لغير الله -

—"তাঁর মাযহাব এই যে, আহ্‌লে-কিতাব যদি যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয

নয়। আবুদ্দারদা, ওবাদা ইবনে সামেত এবং একদল সাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেক (র)-এর মতও তাই। নাখ্‌য়ী ও সওরী এরূপ জন্তুকে খাওয়া মকরূহ মনে করেন।"

---(বাহ্‌রে-মুহীত, ৪৩১ পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড)

মোট কথা, সাহাবী তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, আহ্‌লে-কিতাবদের আসল মযহাব হচ্ছে, যে জন্তুকে যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম পরিত্যাগ করা হয়, তা হারাম। তাদের এ মযহাব কোরআন অবতরণের সময়ও অব্যাহত ছিল। এমনিভাবে বিবাহ হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারেও আহ্‌লে-কিতাবদের আসল মযহাব বর্তমানকাল পর্যন্ত অধিকাংশ বিষয়ে ইসলামী শরীয়তেরই অনুরূপ। এর বিপরীতে আহ্‌লে-কিতাবদের মধ্যে যা কিছু দেখা গেছে, তা মূর্খ লোকদের ভুলভ্রান্তি—তাদের ধর্মমত নয়।

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইঞ্জীল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহাদনামায় যবেহ্ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে ঃ

১. যে জন্তু আপনা-আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তুকে অন্য কোন হিংস্র প্রাণী ছিঁড়ে ফেলে, তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পার, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পারবে না। (আহবার, ২৪)

২. যে কোন পন্থা-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বরকত অনুযায়ী যবেহ্ করে মাংস খেতে পারবে, কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ো না। —(ইস্তিস্না, ১২—১৫)

৩. তোমরা দেবদেবীর নামে কুরবানীর মাংস, রক্ত, কণ্ঠরোধে জীব-জন্তু হত্যা করা এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক।—(আহ্‌দনামা জাদীদ কিতাব 'আমাল ১—২৯)

৪. খৃস্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিস্থিউনের নামে প্রথম পত্রে লিখেন ঃ বিধর্মীরা যেসব কুরবানী করে তা শয়তানের জন্য করে, আল্লাহ্‌র জন্য নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অংশীদার হও। তুমি খোদাওয়ান্দের পিয়ালা ও শয়তানের পিয়ালা দুটি থেকেই পান করতে পার না। ---(ক্রিস্থিউন ১০-২০-৩০)

৫. 'আ'মলে হাওয়ারিয়্যীন' গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাংসা লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেবীর কুরবানীর মাংস থেকে এবং কণ্ঠরোধে জীব হত্যা হারাম কর্ম থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখবে। ---(আ'মাল ২১—২৫)

এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও হুবহু কোরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়বস্তুগুলো অবশিষ্ট রয়েছে। কোরআনের আয়াত এই ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ

اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ -

'অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা হয়, কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু, আঘাতজনিত কারণে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র প্রাণীর ভক্ষণ করা মৃত জন্তু—তবে যদি তোমরা যবেহ্ করে পাক করে নিতে পার এবং ঐ জন্তু যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয়। (আল্-মায়েদাহ্, ৬)।

এ আয়াতে উল্লিখিত সকল প্রকার জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেও শূকরের মাংস ছাড়া প্রায় সবগুলোকেই হারাম বলা হয়েছে। শুধু আঘাত লেগে, উচ্চস্থান থেকে পতনে এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু এগুলো সবই প্রায় আপনা-আপনি মৃত অথবা কণ্ঠরোধে মৃত জন্তুরই অন্তর্ভুক্ত।

এমনিভাবে কোরআন পাক জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার প্রতি জোর দিয়েছে كُلُوْا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ এবং যে জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় না, তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে ঃ لَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বাইবেলের উপরোক্ত ২নং উদ্ধৃতিতেও এর প্রতি জোর বোঝা যায় যে, জন্তুকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ্ করতে হবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যাপারেও আহ্লে-কিতাবদের ধর্মমত অধিকাংশ বিষয়ে ইসলামেরই অনুরূপ।

দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যন্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঐসব মহিলা, যাদেরকে কোরআন হারাম করেছে। এমন কি, جمع بين الاختين অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্তিপূজারী ও মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ ঃ

"তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের স্বীয় কন্যা দান করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্য তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রদের বিমুখ করে দেবে---যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে।

---(ইস্তিস্না, ৭-৩-৪)

সারকথা ঃ কোরআনে আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু এবং তাদের মহিলাদের বিবাহ হালাল এবং অন্যান্য কাফিরের যবেহ্ করা জন্তু ও তাদের মহিলাদের বিবাহ হারাম করার কারণই এই যে, এ দুইটি বিষয়ে আহ্‌লে-কিতাবদের প্রকৃত ধর্মমত আজ পর্যন্তও ইসলামী আইনের অনুরূপ। এর বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের মধ্যে যা কিছু দেখা যায়, তা নিছক ভুলভ্রান্তি—ধর্মমত নয়। এ কারণেই সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদদের মতে সূরা বাকারা, সূরা আন'আম ও সূরা মায়েদার আয়াতসমূহে কোন বিরোধ অথবা নস্‌খ নেই। যেসব আলিম ও তাবেয়ী ভ্রান্ত জনগণের কর্মকেও আহ্‌লে-কিতাবদের কাতারে শামিল করেছেন এবং সূরা বাকারা ও সূরা আন'আমের আয়াতে নস্‌খের উক্তি অবলম্বন করেছেন, তাদের এ মতের ভিত্তি এই যে, খৃস্টানরা বলে ঃ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ- অর্থাৎ মসীহ ইবনে মরিয়মই তো আল্লাহ্। অতএব, তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলেও তার অর্থ মসীহ ইবনে মরিয়মই হয়। তাই যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ও মসীহর নাম উচ্চারণ করা উভয়ই সমান। এ কারণে তাঁরা আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে আরাবী আহ্‌কামুল-কোরআন গ্রন্থে এ ভিত্তিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। —(প্রথম খণ্ড, ২২৯ পৃঃ)

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ আলিমরা এ ভিত্তি গ্রহণ করেন নি। ইবনে-কাসীর ও বাহ্‌রে-মুহীতের বরাতসহ একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তফসীরে মযহারীর গ্রন্থকার বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ

والصحيح المختار عندنا هو القول الاوّل- يعنى ذبائح اهل الكتاب تاركًا للتسمية عامدًا او على غير اسم الله تعالى لا يوكل ان عليه ذالك يقينًا او كان غالب حالهم ذالك وهو محمل النهى عن اكل ذبائح نصارى بنى العرب ومحمل قول على (رض) لا تأكلوا من ذبائح نصارى بنى تغلب فانّهم لم يتمسكوا من النصرانية بشئ الا بشربهم الخمر فلعل عليًا علم من حالهم انهم لا يسمون الله عند الذبح او يذبحون على غير اسم الله هكذا حكم نصارى العجم ان كان عادتهم الذبح على غير اسم الله تعالى غالبًا لا يوكل ذبيحتهم ولا شك ان النصارى فى هذا الزمان لا يذبحون بل يقتلون بالوقذ غالبًا فلا يحل طعامهم -

অর্থাৎ প্রথমোক্ত উক্তিই আমাদের মতে বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। অর্থাৎ আহ্‌লে-কিতাবদের ঐ জন্তু হালাল নয়, যা যবেহ্ করার সময় ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহ্‌র নাম ছেড়ে দেওয়া হয়, অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা হয়। যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ জন্তুটি যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি, অন্যের নাম উচ্চারণ করা

হয়েছে অথবা যদি তাদের সাধারণ অভ্যাসই এরূপ হয়, তবেই তা হালাল নয়। যেসব আলিম আরবের খৃস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তাই। এমনিভাবে হযরত আলী (রা)-র উদ্দেশ্যও তাই, যিনি বনী তাগলিবের খৃস্টানদের যবেহ্ করা জন্তু নাজায়েয বলেছেন। কারণ, তারা খৃস্টধর্ম থেকে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেনি। হযরত আলী (রা) হয়ত একথা নিশ্চিতরূপে জেনে থাকবেন যে, বনী তাগলিব যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না অথবা অন্যের নাম উচ্চারণ করে। অনারব খৃস্টানদের বেলায়ও একই কথা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করাই যদি তাদের সাধারণ অভ্যাস হয়, তবে তাদের যবেহ্ করা জন্তু অবৈধ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আজকালকার খৃস্টানরা যবেহ্ করে না ; বরং সাধারণত আঘাত করে হত্যা করে। কাজেই তাদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল নয়।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এ বিস্তারিত আলোচনার কারণ এই যে, এক্ষেত্রে মিসরের প্রখ্যাত আলিম মুফতী আবদুহু চরম পদস্খলনের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যা যে কোরআন, সুন্নাহ্ ও সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি 'তফসীর আল-মানার' গ্রন্থে এক্ষেত্রে দু'টি ভুল করেছেন।

এক. তিনি সারা বিশ্বের কাফির, অগ্নি-উপাসক, হিন্দু, শিখ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে আহ্লে কিতাবের অর্থ এত দিগন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছেন যে, সমগ্র কোরআনে বর্ণিত আহ্লে-কিতাব কাফির ও আহ্লে-কিতাব নয় এমন কাফিরের বিভাগ ও বিভেদ সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

দুই. পূর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুলটি এই যে, তিনি আহ্লে-কিতাবদের খাদ্যের অর্থে তাদের যাবতীয় খাদ্য হালাল করে দিয়েছেন। তারা জন্তু যবেহ্ করুক বা না করুক আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করুক বা না করুক,---সর্বাবস্থায় তারা যেভাবে জন্তুকে খায়, সেভাবেই খাওয়া মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন।

তাঁর এ ফতোয়া মিসরে প্রকাশিত হলে স্বয়ং মিসরের এবং সারা বিশ্বের খ্যাতনামা আলিমরা একে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন। এর উপর বিস্তর কথিকা ও পুস্তিকা লেখা হয়। চতুর্দিক থেকে মুফতী আবদুহুকে মুফতীর পদ থেকে অপসারণের দাবী জানানো হয়। এদিকে মুফতী সাহেবের শিষ্যবর্গ ও কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্যঘেঁষা ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার প্রেমিক পত্র-পত্রিকায় আলোচনার জাল বিস্তার করতে থাকে। কারণ, এ ফতোয়াটিতে তাদের চলার পথের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ছিল এবং ইউরোপের খৃস্টান ও ইহুদীদের এমনকি নাস্তিকদের সর্বপ্রকার খাদ্য তাদের জন্য হালাল সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ইসলামের এটিও একটি মো'জেযা যে, শরীয়ত-বিরোধকথা যতবড় আলিমের মুখ থেকেই বের হোক না কেন, সাধারণ মুসলমানরা তাতে সন্তুষ্ট হয় না। এ ব্যাপারেও তাই হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা একে পথভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছে। ফলে ব্যাপারটি তখনকার মত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু বর্তমান যুগের ধর্মদ্রোহীদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইসলামের এমন একটি নতুন সংস্করণ তৈরী করা—যা পাশ্চাত্যের সব বাজে ও মিথ্যা সভ্যতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং নতুন বংশধরদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সহায়ক হয়। এ কারণে

তারা এমন ভঙ্গিতে উপরোক্ত আলোচনার অবতারণা শুরু করেছে, যেন তারাই এ বিষয়বস্তুর উদ্ভাবক। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তারা সবাই মুফতী আবদুহুর ফতোয়ার অনুকরণ করছে। এ কারণে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

আলহামদু লিল্লাহ, যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু আলোচনা হয়ে গেছে।

এস্থলে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, মুসলমানদের খাদ্য আহলে-কিতাবদের জন্য জায়েয---আলোচ্য বাক্যের এ দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য কি? কেননা, আহলে-কিতাবরা কোরআনের বাণীতে বিশ্বাসই করে না। এমতাবস্থায় তাদের জন্য কোন্‌টি হালাল, কোন্‌টি হারাম, কোরআনে তা বর্ণনা করার উপকারিতা কি?

বাহরে-মুহীত প্রভৃতি তফসীরে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ নির্দেশটিও মুসলমানদের জন্য বর্ণনা করাই লক্ষ্য যে, তোমাদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য হালাল। কাজেই তোমরা যদি তা থেকে কোন অমুসলমান আহ্‌লে-কিতাবকে খাইয়ে দাও তবে তাতে কোন গোনাহ নেই। অর্থাৎ স্বীয় কুরবানীর কিছু অংশ কোন আহলে-কিতাব ব্যক্তিকেও দিতে পার। বস্তুত মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য হারাম হলে তা তাদেরকে খাওয়ানো মুসলমানদের জন্য জায়েয হত না। অতএব, বাহ্যত আহলে-কিতাবদের উদ্দেশ্যে নির্দেশটি বর্ণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

তফসীরে রূহুল মা'আনীতে সুদ্দীর বরাত দিয়ে এ বাক্যের আরও একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আহলে-কিতাব ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মমতে সাজা হিসাবে কতক হালাল জন্তু অথবা তার অংশ বিশেষ হারাম করা হয়েছিল। এ কারণে সে জন্তু অথবা তার অংশ বিশেষ বাহ্যত আহলে-কিতাবদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আলোচ্য বাক্যটি ব্যক্ত করেছে যে, যে জন্তু তোমাদের জন্য হালাল---যদিও আহলে-কিতাবরা একে হালাল মনে নাও করে---যদি তাদের হাতে যবেহ করা এরূপ জন্তু পাওয়া যায়, তবে তাও মুসলমানদের জন্য হালালই হবে। وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ বর্ণনা অনুযায়ীও পরিণামে বাক্যটির সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে হয়ে গেছে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জন্তু উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্য হালাল এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু আহলে-কিতাবদের জন্য হালাল, কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হালাল বটে, কিন্তু আহলে-কিতাবদের সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়।

তৃতীয় বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা খৃস্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ করা জন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি

জরুরী ও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা খৃস্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল বলে গণ্য হবে।

আয়াতের তৃতীয় বাক্য হচ্ছে ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ○

অর্থাৎ তোমাদের জন্য মুসলমান সতীসাধ্বী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। এমনিভাবে আহলে-কিতাবদের সতীসাধ্বী মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল।

এখানে উভয় স্থলে مُحْصَنَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধান ও সাধারণ বাচনভঙ্গিতে এর অর্থ দুটি। এক. স্বাধীন ও মুক্ত—এর বিপরীতে ক্রীতদাসী। দুই. সতীসাধ্বী মহিলা। আভিধানিক দিক দিয়ে এখানে উভয় অর্থই বোঝানো যেতে পারে।

এস্থলে তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে محصنات শব্দের অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত মহিলা। অতএব, বাক্যের সারমর্ম এই যে, আহলে-কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের জন্য হালাল---ক্রীতদাসী হালাল নয়। ---(মাযহারী)

কিন্তু অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমের মতে محصنات এর অর্থ সতীসাধ্বী মহিলা। আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমান সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করা যেমন জায়েয তেমনি আহ্‌লে-কিতাবদের সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করাও জায়েয। —(আহকামুল কোরআন, জাসসাস, মাযহারী)

কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সতীসাধ্বী মহিলা হালাল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা সতীসাধ্বী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম। বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম ও উপযুক্ত বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ কর কিংবা আহলে-কিতাব মহিলাকে---সর্বক্ষেত্রে সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাজ নয়।—(মাযহারী)

অতএব, এ বাক্যের বিষয়বস্তু হল এই যে, মুসলমানের জন্য কোন মুসলমান

মহিলাকে অথবা আহলে-কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে সতীসাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে 'আহলে-কিতাব' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহ্‌লে-কিতাব নয়— এমন অমুসলিম মহিলাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হল।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেসব অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ইহুদী ও খৃস্টান জাতিদ্বয়ই আহ্‌লে-কিতাব সম্প্রদায় হতে পারে, তাদের ছাড়া বর্তমানকালের আর কোন সম্প্রদায়ই আহলে-কিতাব নয়। অগ্নিউপাসক অথবা মূর্তিপূজক হিন্দু অথবা শিখ, আর্য, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই এ শ্রেণীভুক্ত। কেননা, একথা বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এমন কোন গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণের দাবী করে, যার ঐশী গ্রন্থ ও প্রত্যাদেশ হওয়া কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত, তারাই আহলে-কিতাব। বলা বাহুল্য তওরাত ও ইঞ্জীলই এমন কিতাব এবং এ কিতাবদ্বয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান জগতে বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া যবুর ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা জগতে কোথাও বিদ্যমান নেই এবং এগুলোর অনুসরণ করে বলে কেউ দাবীও করে না। বর্তমান যুগে 'বেদ' 'গ্রন্থসাহেব' 'যরথুস্ত্র' ইত্যাদিও পবিত্র কিতাব বলে কথিত হয়। কিন্তু কোরআন ও সুন্নায় এগুলোর ওহী ও ঐশী গ্রন্থ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত যবুরও ইবরাহিমী সহীফার বিকৃত রূপ, যা কালচক্রে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটক, বেদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে—এরূপ নিছক সম্ভাবনাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হল যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে একমাত্র ইহুদী ও খৃস্টান মহিলাদের সাথেই মুসলমানদের বিয়ে হালাল। অন্য কোন ধর্মাবলম্বী মহিলার সাথে, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়, ততক্ষণ মুসলমানের বিয়ে হারাম।

কোরআনের আয়াত وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ—এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এই যে, কোন মুশরিক মহিলাকে ততক্ষণ বিয়ে করো না, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়। আহলে-কিতাব ছাড়া বর্তমান জগতের সব সম্প্রদায়ই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

মোট কথা, এ ব্যাপারে কোরআন মজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে ঃ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কোন মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। অপরটি সূরা মায়েদার আলোচ্য বাক্য—যাতে বলা হয়েছে যে, আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয।

তাই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী উভয় আয়াতের মর্ম এই সাব্যস্ত করেছেন যে, নীতিগতভাবে অমুসলিম মহিলার সাথে মুসলমানের বিবাহ না হওয়া উচিত। কিন্তু সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাব মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে ইহুদী ও খৃস্টান মহিলাদের ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের মহিলার সাথে মুসলমান হওয়া ব্যতীত মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না।

এখন রইল ইহুদী ও খৃস্টান মহিলাদের ব্যাপার। কোন কোন সাহাবীর মতে এ বিয়েও জায়েয নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের মতও তাই। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেনঃ কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি সুস্পষ্ট وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ অর্থাৎ 'মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না।' তারা মরিয়ম—তনয় ঈসাকে অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ্ ও পালনকর্তা সাব্যস্ত করে। এর চাইতে বড় শিরক আর কোন্‌টি তা আমার জানা নেই। —(আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

একবার মায়মুন ইবনে মহ্‌রান হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমরা যে দেশে বসবাস করি, সেখানে অধিকাংশই আহ্‌লে-কিতাব। আমরা তাদের মেয়েদের বিয়ে করতে এবং তাদের যবেহ্ করা জন্তু খেতে পারি কি? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর উত্তরে উপরোক্ত আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। একটিতে মুশরিক মহিলাদের বিয়ে করা হারাম বলা হয়েছে এবং অপরটিতে আহ্‌লে-কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা হালাল বর্ণিত হয়েছে।

মায়মুন ইবনে মহ্‌রান বললেনঃ কোরআন পাকের এ দুটি আয়াত আমিও পাঠ করি এবং জানি। আমার প্রশ্ন এই যে, উভয় আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য শরীয়তের নির্দেশ কি? উত্তরে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর পুনর্বার আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বললেন না। মুসলিম আলিমরা এর অর্থ এই ধরেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর আহ্‌লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না।

কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে আহ্‌লে-কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হলেও এ বিয়ের ফলে নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য বরং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেবে, তার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতেও আহ্‌লে-কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা মাকরূহ তথা অনুচিত।

জাসসাস আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে শাকীক ইবনে সালামার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) মাদায়েন পৌঁছে জনৈকা ইহুদী স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করেন। হযরত ফারুকে আযম (রা) সংবাদ পেয়ে তাঁকে পত্র লিখে বললেনঃ স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিয়ে দাও। হযরত হোযায়ফা উত্তরে লিখলেন যে, সে কি আমার জন্য হারাম? খলীফা উত্তরে লিখে পাঠালেন যে, আমি হারাম বলি না, কিন্তু ইহুদী স্ত্রীলোকেরা সাধারণভাবে সতীসাধ্বী নয়। তাই আমার আশঙ্কা যে, এ পথে তোমাদের পরিবারেও না অশ্লীলতা ও ব্যভিচার অনুপ্রবেশ করে! 'কিতাবুল আসার' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান এ

ঘটনাকে ইমাম আবূ হানীফার অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ দ্বিতীয় বার হযরত ফারুকে আযম (রা) হোযায়ফাকে যে পত্র লেখেন তার ভাষা ছিল এরূপ ঃ

اعزم عليك ان لاتضع كتابى حتى تخلى سبيلها فانى اخاف ان يقتديك المسلمون فيختاروا نساء اهل الذمة لجمالهن وكفى بذالك فتنة لنساء المسلمين ٥

অর্থাৎ তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, পাঠান্তে এ পত্র রাখার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দাও। আমার আশঙ্কা হয় অন্য মুসলমানরাও না আবার তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে! ফলে তারা রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যিম্মী আহ্লে-কিতাব মহিলাদের মুসলমান মহিলাদের বিপরীতে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করবে। মুসলমান মহিলাদের জন্য এর চাইতে বড় বিপদ আর কিছু হবে না। —কিতাবুল আছার, পৃষ্ঠা : ১৫৬।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র) বলেন ঃ হানাফী মযহাবের ফিকহ্বিদরা এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এ বিয়েকে হারাম বলেন না; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণে মকরূহ মনে করেন। আল্লামা ইবনে হুমাম 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ শুধু হোযায়ফা নন, তাল্হা এবং কা'ব ইবনে মালেকও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁরাও সূরা মায়েদার আয়াতদৃষ্টে আহ্লে-কিতাব মহিলাদের পাণি গ্রহণ করেন। খলীফা ফারুকে-আযম (রা) সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং তালাক দানের নির্দেশ দেন। --(মাযহারী)

ফারুকে-আযমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। কোন ইহুদী ও খৃস্টান মহিলা মুসলমানের সহধর্মিণী হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে---- সে যুগে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যভিচার থাকলে তদ্দ্বারা আমাদের পরিবার কলুষিত হয়ে পড়বে কিংবা তাদের রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মানুষ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেবে; ফলে মুসলমান মহিলারা বিপদে পতিত হবে—এটিই ছিল তখনকার যুগের একমাত্র আশঙ্কা। কিন্তু ফারুকে-আযমের দূরদর্শী দৃষ্টি অতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই উপরোক্ত সাহাবীদের তালাক দানে বাধ্য করেছিলেন। যদি আজকালকার চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকত, তবে অনুমান করুন, একে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতেন? প্রথমত আজকাল যারা আদমশুমারীর খাতায় নিজেকে ইহুদী অথবা খৃস্টান নামে লিপিবদ্ধ করায়, তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক দিয়ে খৃস্টবাদ ও ইহুদীবাদকে অভিশাপ মনে করে। তারা যেমন তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে না, তেমনি হযরত ঈসা (আ) ও মূসা (আ)-কে আল্লাহ্র রসূল মনে করে না। বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা পুরোপুরি নাস্তিক। শুধু জাতিগত অথবা প্রথাগতভাবে নিজেকে ইহুদী বা খৃস্টান বলে।

এমতাবস্থায় তাদের স্ত্রীলোক মুসলমানের জন্য কিছুতেই হালাল নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদেরকে মুসলমান পরিবারে স্থান দেওয়া গোটা পরিবারের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংস ডেকে আনার শামিল। এই যুগে এ পথে ইসলাম ও মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত হয়েছে এবং এখনও তা

অব্যাহত রয়েছে। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, একটি মেয়ে গোটা একটা মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস করে দিয়েছে। এগুলো এমন বিষয় যে, কোন সচেতন মানুষই অন্যদেরকে এরূপ সুযোগ দিতে পারে না।

মোট কথা, কোরআন-সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে-কিরামের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আজকালকার তথাকথিত আহ্‌লে-কিতাব স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা থেকে বিরত থাকাই মুসলমানদের উচিত। আয়াতের শেষাংশে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আহ্‌লে-কিতাব স্ত্রীলোকদের রাখতেই চাও, তবে নিয়মিত বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে রাখ। তাদের মোহর ইত্যাদি প্রাপ্য পরিশোধ কর। তাদেরকে পরিচারিকা হিসাবে রাখা এবং ব্যভিচারে ব্যবহার করা হারাম।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ
اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ
وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ
جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ
اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ
الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۞

(৬) হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই সহ ধৌত কর এবং পদযুগল গিঁটসহ; আর তোমাদের মাথাসমূহ মাসেহ কর। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তোমাদের পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা

তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের জাগতিক জীবন ও পানাহার সম্পর্কিত কিছু বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইবাদত সম্পর্কিত কিছু বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযে দণ্ডায়মান হও (অর্থাৎ নামায পড়ার ইচ্ছা কর এবং তখন যদি ওযু না থাকে) তখন (ওযু করে নাও, অর্থাৎ) স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুইসহ ধৌত কর এবং মাথায় (ভিজা) হাত মুছে ফেল এবং পদযুগলকে গিঁটসহ (ধৌত কর) এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে (নামাযের পূর্বে) সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও (এবং পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হয়) অথবা প্রবাসে থাক (এবং পানি পাওয়া না যায়, একথা পরে বর্ণিত হচ্ছে। এটি হচ্ছে ওযরের অবস্থা) অথবা (রোগ ও প্রবাসের ওযর নেই; বরং এমনিতেই ওযু অথবা গোসল নষ্ট হয়ে যায়, এভাবে যে, উদাহরণত) তোমাদের কেউ (প্রস্রাব অথবা পায়খানার) ইন্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে আসে (যদ্দরুন ওযু নষ্ট হয়ে যায়) অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর (যদ্দরুন গোসল ফরয হয়ে যায়। এবং) অতঃপর (এসব অবস্থায়) তোমরা পানি (ব্যবহারের সুযোগ) না পাও (ক্ষতিকর হওয়া কিংবা পানি পাওয়া যে কোন কারণেই হোক) তবে (সর্বাবস্থায়) তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মুছে ফেল ঐ মাটির উপরে (হাত মেরে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এসব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে) তোমাদেরকে কোনরূপ অসুবিধায় ফেলতে চান না (বরং তোমাদের অসুবিধা না হোক, তাই চান। সেমতে উল্লিখিত বিধি-বিধানে বিশেষভাবে এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানে সাধারণভাবে যে সহজ দিক ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তা সবারই জানা)। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান। (তাই পবিত্রতার রীতিনীতি ও পদ্ধতিই প্রবর্তন করেছেন এবং কোন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হন নি যে, সেটি না হলে পবিত্রতাই সম্ভবপর হবে না। উদাহরণত যদি পানিকেই একমাত্র পবিত্রকারী বস্তু হিসাবে সাব্যস্ত করা হত, তবে পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অর্জিত হতে পারত না। শারীরিক পবিত্রতা তো বিশেষভাবে পবিত্রতার বিধি-বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং আন্তরিক পবিত্রতা সব ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আয়াতে বর্ণিত 'পবিত্রকরণ' বাক্যে উভয় পবিত্রতাই শামিল। এসব বিধি-বিধান না থাকলে কোন পবিত্রতাই অর্জিত হত না)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান—(এ কারণে পূর্ণ বিধি-বিধান দান করেছেন —যাতে সর্বাবস্থায় শারীরিক ও আন্তরিক পবিত্রতা অর্জন করতে পার, যার ফল হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য এবং এ সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বৃহৎ নিয়ামত)। যাতে তোমরা (এ দানের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে আদেশ পালন করাও একটি)।

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সে নিয়ামতকে, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে স্মরণ কর। (তন্মধ্যে বড় নিয়ামত হচ্ছে এই যে, তোমাদের সাফল্যের নিয়ম-কানুন তোমাদের জন্য শরীয়তসিদ্ধ করে দিয়েছেন) এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও (স্মরণ কর) যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা (তা নিজের জন্য জরুরীও করে নিয়েছিলে। অর্থাৎ অঙ্গীকার নেওয়ার সময় তোমরা) বলেছিলে ঃ আমরা (এসব বিধি-বিধান) শুনলাম এবং মেনে নিলাম (কেননা, ইসলাম গ্রহণের সময় প্রত্যেকেই এই বিষয় অঙ্গীকার করে) এবং আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। (তাই যে কাজই কর তাতে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসও থাকা দরকার। কপট-সুলভ আদেশ পালন যথেষ্ট নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এসব বিধি-বিধানে প্রথমত তোমাদেরই উপকার, তদুপরি তোমরা তা নিজের যিম্মায় জরুরীও করে নিয়েছ। এছাড়া বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে ক্ষতিও আছে—এসব কারণে আদেশ পালন করা জরুরী হয়েছে। এ পালনও অন্তরের সাথে হওয়া উচিত। নতুবা পালন না করার মতই গণ্য হবে)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

(৮) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহ্‌ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (১০) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে তারা দোযখী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টির) জন্য (বিধি-বিধানের) পূর্ণ অনুবর্তী এবং সাক্ষ্যদানের (প্রয়োজন হলে) সাক্ষ্যদাতা হও এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (তাদের ব্যাপারে) সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। (অবশ্যই প্রত্যেক ব্যাপারে) সুবিচার কর। (অর্থাৎ সুবিচার করা) আল্লাহ্-ভীতির নিকটবর্তী। (অর্থাৎ এর কারণে মানুষ আল্লাহ্-ভীরুতার গুণে গুণান্বিত হয়।) এবং (আল্লাহ্-ভীতি তোমাদের প্রতি

ফরয। তাই নির্দেশ এই যে) আল্লাহ্ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর। (এটিই আল্লাহ্-ভীতির স্বরূপ। সুতরাং যে সুবিচারের উপর আল্লাহ্-ভীতি নির্ভরশীল, তাও ফরয)। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং আদেশ অমান্য-কারীদের সাজা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারাই দোযখে বসবাসকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ---বলা হয়েছিল এবং এখানে--- كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ - شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ বলা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ 'বাহরে-মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই ঃ

স্বভাবত দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। এক. নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। দুই. কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সূরা নিসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাক্যের পর বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا - অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়-বিচারে পশ্চাৎপদ হতে উদ্বুদ্ধ না করে।

অতএব সূরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায়বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায় তবুও তাতে কায়েম থাক। সূরা মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণে সূরা নিসার আয়াতে قسط অর্থাৎ 'ইনসাফ'কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ—এবং সূরা মায়েদার আয়াতে لله -কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্‌র জন্যই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহ্‌র জন্যই। তাই এখানে قسط শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্‌র জন্য হতে পারে না। সূরা মায়েদায় শত্রুদের সাথে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لله শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার কর।

মোট কথা এই যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক. শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা বউচিত নয়। দুই. সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না—যাতে চীরকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গীতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ অর্থাৎ সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী। এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গোনাহ।

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কোরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বারবার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানিরও সম্মুখীন হতে হয়। এতে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ-কারবার তো নষ্ট হয়ই; তদুপরি অর্থহীন যাতনাও ভোগ করতে হয়।

এ কারণেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেওয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ অর্থাৎ মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন ক্ষতি করা যাবে না।

আজকালকার আদালত ও মোকদ্দমাসমূহের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দাঁড়ায়, বাস্তবে যা আমরা আজকাল দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা দশ-পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যায় এবং সুবিচার-ভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণত এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বারবার পেরেশান করা না হতো, তবে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী কোন সত্যবাদী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই, যে পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বারবার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্য ছেলেদেরকেও ওসিয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে পৌঁছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেওয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হিজায ও অপর কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদাসিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নেই অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষ্যদানও কষ্টকর নয়।

মোট কথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার-পদ্ধতিকে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে, অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে জবানবন্দী নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোটদান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ পরিশেষে এখানে আর একটি বিষয় জানা জরুরী। তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমায় কোন

বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'শাহাদত' শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণত যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকরি করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবীরা গোনাহ্ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়া একটি শাহাদত। যদি ইচ্ছা-পূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশী নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কজন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়। আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনও চিন্তা করে না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ্র অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে—যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, তাকে সুপারিশকৃত ব্যক্তির পুণ্য থেকে অংশ দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ ভোটপ্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোটদাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্য সে নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমন সব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে বসবে।

মোট কথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। এক. সাক্ষ্যদান, দুই. সুপারিশ করা এবং তিন. সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করা যেমন বিরাট সওয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোট-দাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কি না, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশত অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ
أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ
وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ
إِسْرَٰٓءِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ
لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ
جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾

(১১) হে মু'মিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মু'মিনদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আল্লাহ্ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন ঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ্ দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাবো, যাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফির হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতকে স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় (অর্থাৎ কোরায়েশ কাফিররা---ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে) এরূপ চিন্তায় লিপ্ত ছিল যে, তোমাদের প্রতি (এমনভাবে) হস্ত প্রসারিত করবে (যেন তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হস্ত তোমাদের প্রতি (এতটুকু) চলতে দিলেন না (এবং অবশেষে তোমাদেরই জয়ী করলেন। সুতরাং এ নিয়ামতটি স্মরণ কর) এবং (নির্দেশ প্রতিপালনে) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (এটিই উক্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা)। আর (ভবিষ্যতেও) বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা উচিত। (যিনি পূর্বে তোমাদের সব কাজ ঠিক করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও পরকাল পর্যন্ত আশা রাখ। اتَّقُوا اللّٰهَ বলে ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং ভরসা করার আদেশ করে আশা দিয়েছেন। এ দুটিই আদেশ প্রতিপালনে সহায়ক।) আর আল্লাহ্ তা'আলা (হযরত মূসার মাধ্যমে) বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে (-ও) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (সত্বরই এর বর্ণনা আসবে) এবং (এসব অঙ্গীকার জোরদার করার জন্য) আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদের গোত্রের সংখ্যা অনুযায়ী) বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম (যাতে তারা অধীনস্থদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য জোর দিতে থাকে) এবং (অঙ্গীকারের উপর আরও জোর দেওয়ার জন্য তাদেরকে) আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা (-ও) বলে দিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। (তোমাদের ভালমন্দ সব কিছুর খবর রাখব। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে অঙ্গীকার নিয়েছেন, অতঃপর এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার উপর জোর দিয়েছেন। এ অঙ্গীকারের সার বিষয়বস্তু ছিল এই যে,) যদি তোমরা নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক, আমার সব পয়গম্বরের প্রতি (যারা ভবিষ্যতেও নতুন নতুন আগমন করবেন) বিশ্বাস স্থাপন করতে থাক, (শত্রুদের বিপক্ষে) তাদের সাহায্য করতে থাক এবং (যাকাত ছাড়া সৎকার্যেও ব্যয় করে) আল্লাহ্

তা'আলাকে উত্তম পন্থায় (অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে) ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ্ দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে (বেহেশতের) এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট করাবো, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং যে ব্যক্তি এরপরও (অর্থাৎ অঙ্গীকার নেওয়ার পরও) অবিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ -

এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্" উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। এ কারণেই اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলাকৌশলকে সফল হতে দেন নি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বারবার রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে ব্যর্থকাম করে দেন। বলা হয়েছে ঃ একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফিরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার